মনীষী-জননী

চায়না পাবলিকেশন

২১ এ, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট,

কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম সংস্করণ : ১৯৫৮

প্রকাশক :
বেণু দাস
চায়না পাবলিকেশন
২১এ, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট,
কলকাতা- ৭০০ ০০৯

অক্ষর বিন্যাস :
সুজয় গাঙ্গুলি, বাগবাজার

প্রচ্ছদ অলংকরণ :
সৌরীশ মিত্র

মুদ্রণ :
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলকাতা- ৭০০ ০০৬

নিবেদন

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

গর্ভধারিণী ও দেশমাতা স্বর্গের চেয়ে বড়। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে তাই জননীর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। জননীর প্রভাবই সন্তানের ওপর সর্বাধিক বর্ষিত হয়। নেপোলিয়নের ভাষায় বলতে গেলে—The future good or bad conduct of a child depends entirely on the mother। এক কথায়, ব্যক্তি ও জাতির চরিত্র গঠিত হয় জননীর প্রভাবে। যে-দেশ, যে-জাতি যত বেশি আদর্শ জননী জন্ম দিয়েছে, সেই দেশ, সেই জাতি তত বড় হয়েছে।

জননীর স্থান তাই সবার ওপরে। মনু-সংহিতায় আছে

উপাধ্যায়ন্ দশ আচার্য
আচাযানাম্ শতম্ পিতা।
সহস্রং তু পিতৃণ মাতা
গৌরবেণ অতিরিচ্যতে।

একজন আচার্য গৌরবে দশজন উপাধ্যায়কে অতিক্রম করেন। একজন পিতা শত আচার্যের চেয়ে বড়, আর একজন জননী গৌরবে সহস্র পিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

প্রাচীন কাল থেকে শিল্প-সাহিত্যে তাই জননী দেবীর আসনে অধিষ্ঠিতা। জননী মেরী কিংবা ম্যাডোনার মাতৃমূর্তি যুগে যুগে মানুষকে অলৌকিক আনন্দ দান করেছে। বিশ্বসাহিত্যে তাই, জননী নানারূপে চিত্রিত। বাংলা সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম নেই। স্রষ্টাদের মধ্যে সকলেই প্রায় জননীকে নিয়ে কিছু না কিছু লিখেছেন। এক এক স্রষ্টার চোখে জননীর এক একটি রূপ প্রকাশিত হয়েছে। রজনীকান্ত দেখেছেন জননীর স্নেহ-বিহ্বল 'করুণা-ছলছল' রূপ। দেবেন্দ্রনাথ সেনের অনুভূতিতে জননী উপনীত হয়েছে 'সর্বতীর্থসার' রূপে। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার উপলব্ধি করেছেন—

নিজ—অঙ্গ—অংশ দিয়া
এই তনু নিরমিয়া
চিত হ'তে দিয়া চিত—দীপে দীপ প্রায়
আমায় সৃজেন যিনি
ব্যতার স্বরূপ তিনি;
জীব-দেহ ব্রহ্মাণ্ড সমান তুলনায়।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে, মনীষীরা সকলেই ছিলেন মাতৃভক্ত। নেপোলিয়ন, ওয়াশিংটন, ম্যাটসিনি, জনসন, এণ্ড্রু কার্নেগী, মুসেলিনী, থিওডোর পার্কার, ব্রাউনিং,

বার্নস; কে নন! কার্নেগী তাঁর আত্মচরিতে জননী সম্পর্কে লিখেছেন—The mother nurse, cook, governess, teacher, saint, all in one! মার্ক টোয়েন তাঁর আত্মচরিতে জননীর small body তে অবস্থিত large heart এর কথা স্মরণ করেছেন গভীর শ্রদ্ধাভরে। কবি রবার্ট ব্রাউনিং ছিলেন অত্যন্ত মাতৃভক্ত। তাঁর মাতৃভক্তি সম্পর্কে কবিপত্নী এলিজাবেথ একস্থানে লিখেছেন—He has loved his mother as such passionate natures only can love। বাঙালি মনীষীদের মধ্যে বিদ্যাসাগর রামগোপাল, গুরুদাস আশুতোষ কিংবা চিত্তরঞ্জনের মাতৃভক্তি আজ কিংবদন্তীর মত উচ্চাতির। কথিত আছে—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র জননীর পাদোদক পান করতেন আর রামতনু-ভ্রাতারা জননীকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজো করতেন। মাতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য বিদ্যাসাগর বর্ষার উদ্দাম দামোদর নদ পার হয়েছিলেন সাঁতার কেটে, আর আশুতোষ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন রাজ-সম্মান। নেপোলিয়ন, মাইকেল ফ্যারাডে এবং আলেকজান্ডারের মাতৃভক্তিও বিশ্ববিখ্যাত। আলেকজান্ডার দিগ্বিজয়ে গেলে শাসনকার্যের ভার দিতেন অ্যান্টিপেটারের ওপরে। আলেকজান্ডার জননী অলিম্পিয়া শাসনকার্যে খুবই হস্তক্ষেপ করতেন। আলেকজান্ডারের কাছে প্রায়ই এ অভিযোগ করা হলে, মাতৃভক্ত পুত্র একবার বলেছিলেন—অ্যান্টিপেটার, আমি জানি এটা খুবই অন্যায়। কিন্তু তুমি হয়তো জানো না যে, জননীর এক বিন্দু অশ্রু তোমার পাঁচশত অভিযোগ মুছে ফেলতে পারে।

মনীষীদের জীবন এমনি করেই পূর্ণ করেছিলেন জননীরা। শুধু স্নেহ নয়, সেবা নয়, জননীর আকৃতি ও প্রকৃতিও অনেক মনীষীর জীবন পরিবর্তিত করেছে। লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চির মা ক্যাটেরিনা ছিলেন সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্তি। শিল্পী অমন সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণাও পেয়েছিলেন জননীর কাছে থেকে। গ্যেটের মা ছিলেন আনন্দের প্রতিমা। তাঁর সরলতা ও বৈদগ্ধা কবির কাব্যকেও মহিমান্বিত করেছে। শৈশবে পিতৃহীন নীট্শের জীবন পরিবর্তিত হয়েছিল ধর্মপ্রাণা জননীর স্নেহ-সুধায়। রোঁমা রোঁলার জীবনে মায়ের প্রভাব ছিল অপরিসীম। মায়ের কাছে থেকেই তিনি সাহিত্য ও সঙ্গীতের দীক্ষালাভ করেছিলেন। আইনস্টাইন জননী পলিনও ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের একজন যে শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদকদেরও একজন হতে পেরেছিলেন, সে শুধু জননীর প্রচেষ্টাতেই।

জীবনে আদর্শ জননী না পেলে, পৃথিবীতে অনেক মনীষীই হয়তো হারিয়ে যেতেন। টমাস আলভা এডিসন কিংবা মাইকেল ফ্যারাডেকে পৃথিবীবাসী হয়তো এতবড় বৈজ্ঞানিক হিসেবে দেখতে পেতেন না। যদি না তারা জীবনে অসামান্য

জননীর সাহচর্য লাভ করতেন! ডি. এইচ লরেন্স হয়তো কয়লাখনির শ্রমিক পিতার মতই নিরক্ষর থেকে যেতেন, যদি না তাঁর স্নেহময়ী জননী তাঁকে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যেতেন। এমিল জোলার জীবনে জননী ফ্রাঁসোয়া কিংবা বার্ণাড শ'র জীবনে জননী লুসিন্দার প্রভাবও ছিল এমনই গুরুত্বপূর্ণ! জর্জ ওয়াশিংটন যদি জীবনে জননী মেরীকে না পেতেন, শিবাজীর জীবনে যদি না জননী জীজাবাঈ থাকতেন, নেপোলিয়নকে যদি না জননী লেটিজিয়া নিজের হাতে গড়ে তুলতেন তাহলে তাঁদের কোন্ রূপ আমরা দেখতে পেতাম, কে জানে!

বঙ্গদেশের জাতীয় ইতিহাস অনুশীলন করলেও দেখা যাবে, যেসব মণীষীর প্রতিভার দীপ্তিতে আমরা আলোকিত, সে-দীপ্তির অন্তরালে ছিলেন তাঁদের জননীরা। জননীরাই ছিলেন তাঁদের সমস্ত কর্মপ্রেরণার উৎস, জীবনের ধ্রুবতারা। এমনই কয়েকজন মহীয়সী জননীর চিত্রমালা হল এই গ্রন্থ—জননীদের উদ্দেশে নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ্য।

মাতৃসমা মাতৃষ্বসা
শ্রীমতী বিজলীবালা রুদ্র
শ্রীমতী রেণুকাবালা দত্ত
শ্রীমতী বীণাপাণি সরকার
শ্রীমতী যূথিকা পালিত
পূজনীয়াসু

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।

—(মনু)

ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্ব—সেই অপূর্ব, স্বার্থশূন্য
সর্বংসহা, নিত্যক্ষমাশীলা জননী।

—স্বামী বিবেকানন্দ

সূচীপত্র

রামমোহন-জননী তারিণী দেবী

ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়ের জননী তারিণী দেবী হুগলি জেলার মেয়ে, হুগলি জেলাতেই তাঁর বিয়ে হয়। তিনি শ্রীরামপুরের বিখ্যাত শাক্ত-সাধক শ্যাম ভট্টাচার্যের কন্যা। খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী ব্রজবিনোদ রায়ের পুত্র রামকান্তের সঙ্গে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

তারিণী দেবীর শ্বশুরালয় ছিল ঘোর বৈষ্ণব। শাক্ত পরিবারে লালিত পালিত হলেও, তিনি পতিগৃহে এসে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র সন্তান দুটি—জ্যেষ্ঠ জগমোহন ও কনিষ্ঠ রামমোহন। রামমোহনের ছোটভাই রামলোচন ছিলেন তাঁদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

রামমোহনের পিতৃকুল ছিলেন ঘোর বৈষ্ণব, মাতৃকুল ঘোর শাক্ত। এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় রীতিনীতি রামমোহনের জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তারিণী দেবী অবশ্য পতিগৃহে এসে বৈষ্ণব মতেই দেবারাধনা শুরু করেন।

এ সম্পর্কে রামমোহন-জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একটি গল্পের উল্লেখ করেছেন। একবার তারিণী দেবী শিশুপুত্র রামমোহনকে নিয়ে পিত্রালয়ে আসেন। তাঁর অবস্থানকালে একদিন শ্যাম ভট্টাচার্য শিশু রামমোহনের হাতে পূজোর বেলপাতা দেন। রামমোহন সঙ্গে সঙ্গে মুখে পুরে সে পাতা চিবিয়ে ফেলেন। তারিণী দেবী হঠাৎ সে দৃশ্য দেখতে পেয়ে ছুটে এসে পুত্রের মুখ থেকে বেলপাতা বের করে দেন এবং বাবাকে তিরস্কার করেন। ক্রুদ্ধ পিতৃদের শ্যাম ভট্টাচার্য অভিশাপ দিয়ে বলেন—তুই অহঙ্কার করে আমার পূজার বিল্বপত্র ফেলে দিলি। পুত্র নিয়ে তুই সুখী হতে পারবি না। তোর পুত্র কালে বিধর্মী হবে।

অভিশাপ শুনে তারিণী দেবী আর্তনাদ করে ওঠেন। পিতার পা ধরে অনেক কাকুতি মিনতি করার পর শেষ পর্যন্ত তিনি বলেন—আমার বাক্য

অব্যর্থ, বিফল হবে না। তবে তোর পুত্র রাজ্যপূজ্য ও অসাধারণ হবে।

তাঁর বাক্য যে মিথ্যা হয়নি, রামমোহনের বহুমুখী কর্মজীবনই তার সাক্ষী।

রামমোহন-জননী তারিণী দেবীর অএনক সদগুণ ছিল। তিনি বুদ্ধিমতী ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তাঁর সুগভীর ধর্মানুরাগ দৃষ্টান্ত হিসাবে উচ্চারিত হত। সংসারে সমস্ত কাজকর্মে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া। লোকলৌকিকতা এবং অতিথি আপ্যায়ন, তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত অভিজাত আচার আচরণ সকলকে মুগ্ধ করত। শ্বশুরালয়ে সকলে তাঁকে ফুলুঠাকুরানী বলত। ছোট বড় সকলেই তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত।

রামমোহনের মত সুসন্তানের জননী হয়ে তারিণী দেবীর যত গর্ব ছিল, পুত্রকে নিয়ে সাংসারিক অশান্তিও কিছু কম ছিল না। ষোল বছর বয়সে রামমোহনের গৃহত্যাগ এবং তিব্বতে যাত্রা থেকেই মাতাপুত্রে বিরোধ শুরু হয়। গৃহে প্রত্যাবর্তনের পরও তাঁর ধর্মীয় চিন্তাধারায় শঙ্কিত হয়ে পিতা তাঁকে বহিষ্কার করেন। জননী তারিণী দেবীর অনুরোধেই শেষ পর্যন্ত সহায় সম্বলহীন রামমোহনকে অল্প কিছু অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করা হয়।

রামমোহনের মত যুগান্তকারী প্রতিভার জনক জননীও দেশাচারের অন্ধ সমর্থক ছিলেন। প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে রামমোহনের যুক্তিপূর্ণ আলোচনা এবং আন্দোলনকেও তাঁরা ভ্রষ্টাচার বলে ভুল করেছিলেন।

এই বিরোধপর্বের মধ্যেই রামমোহনের পিতৃদেব ১৮০৩ সালে দেহত্যাগ করেন। সে সময় রামমোহন কিছুদিন পিতৃগৃহে থাকতে চাইলে তারিণী দেবী অসম্মত হন। পৌত্তলিকতার অসারত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা প্রচারের জন্য তিনি তখন পুত্রের ওপর াত্যন্ত ক্রুদ্ধ। বিধর্মী পুত্র এবং তাঁর পত্নীদ্বয়ের সঙ্গে তাই তিনি কোনো সংস্রব রাখতে চাইলেন না। এই ক্ষোভ এবং অভিমানেই রামমোহন রঘুনাথপুরে গিয়ে স্বতন্ত্র গৃহ নির্মাণ করেন। কারণ সমস্ত কৃষ্ণনগর ছিল তারিণী দেবীর জমিদারির অন্তগর্ত। রামমোহন যেস্থানে গৃহ নির্মাণ করেন, সেটি ছিল একটি শশানভূমি। ব্রহ্মজ্ঞানী রামমোহনের গৃহ নির্মাণের স্থান নির্বাচনটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই গৃহেই রমাপ্রসাদের জন্ম হয়।

স্বামীর মৃত্যুর পর তারিণী দেবীর ব্যক্তিত্ব ক্রমশ প্রকাশিত হতে থাকে। প্রকাশ্যভাবে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রচার করার অভিযোগে তিনি

রামমোহনকে সম্পত্তিচ্যুত করার জন্যে তৎকালীন আইন অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মামলায় তিনি হেরে যান।

জয়লাভ করলেও রামমোহন অবশ্য পিতৃসম্পত্তি গ্রহণ করেননি। সাংসারিক ভোগবিলাসের ওপর তিনি চিরকালই বীতরাগ ছিলেন।

জমিদারি পরিচালনায় তারিণী দেবী অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। জটিল বৈষয়িক সমস্যায় তিনি যে সূক্ষ্মবুদ্ধি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত রেখেছেন, তার তুলনা বিরল। সেসময় একজন হিন্দু বিধবার পক্ষে এত বড় বিষয় সম্পত্তি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ কাজ ছিল না। তারিণী দেবীর ধর্মনিষ্ঠা এবং বিচার বোধকে সকলে সমীহ করে চলত। জমিদারি পরিচালনার কাজে এটা তাঁকে খুব সহায়তা করেছিল। কথিত আছে, তিনি কুলদেবতা রাধাগোবিন্দ ও শালগ্রাম শিলা সামনে রেখে জমিদারি পরিচালনা করতেন।

জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে তিনি পুত্রের মহত্ত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে তিনি পুত্রকে বলেন—রামমোহন, তোমার মতই ঠিক। আমি অবলা স্ত্রীলোক এবং বৃদ্ধ—সুতরাং যেসব পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে আমি শান্তি পাই, সেগুলি আমি পরিত্যাগ করতে পারি না। সমস্ত জমিদারিও তিনি তিন পুত্র এবং পৌত্রদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দেন।

বিত্তবান এবং গৌরবদীপ্ত দুটি পরিবারে জীবন কাটলেও তারিণী দেবীর শেষ জীবন কেটেছে স্বেচ্ছাকৃত কৃচ্ছ্র-সাধনায়। জগন্নাথ-সন্নিধানে বাকি দিনগুলি কাটাবার অভিপ্রায়ে তিনি নিতান্ত দুঃখিনীর মত পদব্রজে শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করেন। সঙ্গে একজন দাসী পর্যন্ত নেননি। শ্রীক্ষেত্র যাবার পর তিনি মাত্র দু বছর জীবিত ছিলেন। ঐ সময় তিনি একজন সাধারণ দাসীর মত প্রতিদিন জগন্নাথদেবের মন্দির ঝাঁট দিতেন।

সর্বত্যাগিনী এই মহীয়সী মহিলার জীবনবসান ঘটে ২১ এপ্রিল ১৮২২ তারিখে। রামমোহন-জননী হিসাবে তখন তিনি সর্বজন পরিচিতা, সর্বপূজ্যা।

রামমোহনের চরিত্রে যে দৃঢ়তা একাগ্রতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়, সবই তিনি লাভ করেছিলেন জননীর কাছ থেকে।

বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী

বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবীর একটি প্রতিমূর্তি দেখে রবীন্দ্রনাথ একস্থানে লিখেছেন—''অধিকাংশ প্রতিমূর্তিই অধিকক্ষণ দেখিবার দরকার হয় না, তাহা যেন মুহূর্তকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহা নিপুণ হইতে পারে, সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাঁহার মধ্যে চিত্তনিবেশের যথোচিত স্থান পাওয়া যায় না। চিত্তপটের উপরিতলেই দৃষ্টির প্রসার পর্যবসিতত হইয়া যায়। কিন্তু ভগবতী দেবীর এই পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসার সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়কে বহুদূরে এবং বহু উর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়—এবং ইহাও বুঝিতে পারি, ভক্তি বৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের জন্য কেন বিদ্যাসাগরকে এই মাতৃদেবী ব্যতীত কোনো পৌরাণিক দেবীপ্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।'

ভগবতী দেবীর চরিত্র চিত্রণে এই মন্তব্যটি খুবই মূল্যবান। বস্তুতপক্ষে বাঙালীর ইতিহাসে এমন সর্বগুণসম্পন্না জননী আর অধিক দেখা যায়নি।

ভগবতী দেবীর বাবা রামকান্ত তর্কবাগীশ হুগলী জেলার অন্তর্গত গোঘাটের অধিবাসী ছিলেন। পূজা-আর্চ্চা, দানধ্যান, শাস্ত্রালোচনা—এসব নিয়েই তিনি থাকতেন। ভগবতী তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা। রামকান্ত অল্পবয়সে উন্মাদগ্রস্ত হন বলে ভগবতী দেবী তাঁর মাতুলালয় পাতুল গ্রামে প্রতিপালিত হন। তাঁর মামা রামমোহন বিদ্যাভূষণ সুশিক্ষা এবং স্নেহ দিয়েই তাঁকে মানুষ করেছিলেন। এ হেন রূপবতী, গুণবতী এবং সুলক্ষণা মেয়ের সন্ধান পেয়ে রামজয় তর্কভূষণ হাতছাড়া করতে চাননি। জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন।

ভগবতী দেবী যখন ঠাকুরদাসের পরিবারে বধূ হয়ে আসেন, তখন তাঁদের পরিবারের খুবই অনটন ছিল। কিন্তু ধর্মপ্রাণ দরিদ্র পিতামাতা এবং মাতুলের কাছে তাঁর সুশিক্ষাই হয়েছিল। নতুন পরিবারে এসে তিনি নিজেকে মানিয়ে নেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর মহত্ব ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হতে থাকে। শুধু পরিবারের মধ্যেই নয়, তিনি ঐ অঞ্চলেই আদর্শস্থানীয়া জননীরূপে খ্যাতিলাভ করেন।

ভগবতী দেবী শুধু সুগৃহিণীই ছিলেন না, পরসেবা ও পরদুঃখ কাতরতাই ছিল তাঁর ধর্ম। পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে তিনি খবর আনতেন, কার কিসের অভাব। রূপে-গুণে অদ্বিতীয়া ভগবতী দেবীকে পেয়ে ঠাকুর দাসের জীবনও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। দাম্পত্যজীবনে তিনি স্বর্গীয় সুখ লাভ করেন। পৌত্র নারায়ণচন্দ্র ঠাকুমা-ঠাকুরদাদার দাম্পত্য সুখের একটি অনবদ্য চিত্র উপহার দিয়েছেন। নারায়ণচন্দ্র লিখেছেন—'ঠাকুমা বড় বড় মাছ ভালবাসিতেন। মাছ কুটিয়া রাঁধিয়া খাওয়াইবেন এই তাঁর সাধ। এইজন্য ঠাকুরমা কখন কখন ঠাকুরদাদার উপর রাগ করিলে ঠাকুরদা বড় বড় মাছ আনিয়া তাঁর মানভঞ্জন করিতেন। কোন কোন দিন যদি ঠাকুরমা রাগ করিয়া ঘরের দরজা দিয়া শুইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ঠাকুরদাদা যেখান হইতেই হউক

একটা বড় মাছ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া, ঘরের দরজায় আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিতেন। ঠাকুমা ঘরের ভিতর হইতে মাছ আছড়ানির সাড়া পাইয়া তখন খিল খুলিয়া বাহিরে আসিতেন এবং হাসিতে হাসিতে আপনি মাছ কুটিতে বসিতেন।'

বিদ্যাসাগরের চরিত্রগঠনে তাঁর জনক-জননীর প্রভাব ছিল সর্বাধিক। বিদ্যাসাগর নিজেও বলেছেন—'যদি আমার দয়া থাকে ত মা'র নিকট হইতে পাইয়াছি, বুদ্ধি থাকে ত বাবার নিকট হইতে পাইয়াছি।' একবার কাশীতে অবস্থানকালে তিনি বিশ্বনাথকে মানেন কিনা জিজ্ঞেস করাতে ক্রোধান্ধ বিদ্যাসাগর জবাব দেন—'আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননী দেবী বিরাজমান।'

প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের মানসিক কাঠামোটি নির্মিত হয় জননী ভগবতী দেবীর হাতেই। বিদ্যাসাগর যে প্রচেষ্টাকে 'জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম' বলে চিহ্নিত করেছেন। সেই বিধবা বিবাহ-আন্দোলনেও উৎসাহ জুগিয়েছিলেন জননী ভগবতী দেবী। প্রতিবেশিনী এক বালিকা বিধবার অবর্ণনীয় দুর্দশা দেখে জননী একদিন পুত্রকে ডেকে বলেন—'তুই তো এতবড় পন্ডিত, এই মেয়েদের এই রকম দুর্গতি দূর করার কি কোন উপায় নেই?' জননীর এই আকুল আর্তিতেই তিনি পরবর্তীকালে বিধবা আন্দোলনে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।

পরোপকার ও দয়াধর্মে বিদ্যাসাগরের প্রকৃত দীক্ষা হয় ভগবতীদেবীর জীরন থেকেই। বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানকার ছাত্রদের স্বহস্তে ভরণপোষণ করতেন ভগবতী দেবী। শুধু তাই নয়, জাতি ধর্ম ভুলে পুত্রদেরও সেইসব ছাত্রদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে তিনি খাওয়াতেন। এই বিদ্যালয়টিই পরবর্তীকালে ভগবতী বিদ্যালয় নামে পরিচিত হয়।

দয়ার মাধ্যমে ভগবতী দেবীর একটি সংস্কারমুক্ত উদার ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে—'দয়াবৃত্তি আরো রমণীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল তাহা কোন প্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না।'

বিদ্যাসাগর যখন খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার শীর্ষাসনে অধিষ্ঠিত, তখন স্বাভাবিক কারণেই সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ভগবতী দেবীর সান্নিধ্য আসতেন এবং সকলেই প্রায় তাঁর চরণে মাথা নোয়াতে বাধ্য হতেন। তিনি ছিলেন স্নেহ ও মমতার প্রতিমূর্তি। তাছাড়া আচার আচরণ ছাপিয়ে উঠত তাঁর অসাধারণ মহত্ত্ব।

একবার ইনকাম ট্যাক্সের কমিশনার হ্যারিসন সাহেবকে বিদ্যাসাগর বীরসিংহ গ্রামে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু হ্যারিসন সাহেব জানান যে, তিনি হিন্দু প্রথা অনুযায়ী বাড়ির কর্তা বা কর্ত্রী নিমন্ত্রণ না করলে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন না। সেকথা শুনে ভগবতী দেবী হ্যারিসন সাহেবকে নিমন্ত্রণ করে পাঠান। হ্যারিসন সাহেব বীরসিংহ গ্রামে এসে হিন্দু প্রথামত জননী ভগবতী দেবীকে প্রণাম করেন এবং আসন পিঁড়িতে বসে আহার করেন। ভগবতী দেবীর আচার আচরণে মুগ্ধ হয়ে হ্যারিসন সাহেব বলেছিলেন—ইনি হলেন দ্বিতীয় রোমক জননী কর্নিলিয়া।

জননী ভগবতী দেবীকে বিদ্যাসাগর শুধু ভক্তিশ্রদ্ধাই করতেন না, দেবী জ্ঞানে পূজা করতেন। তাঁর মাতৃভক্তি তাই আজ প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। মাতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য তাঁর বর্ষায় দামোদর নদ পার হওয়ার কাহিনীও আজ সর্বজন বিদিত। কর্তৃপক্ষ মার্শাল সাহেব পর্যন্ত তাঁর মাতৃভক্তি দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। জননীর প্রতি এই অপরিসীম ভক্তিতে তাঁর গোটা নারী জাতির

ওপরেই শ্রদ্ধাভক্তি বেড়ে যায়। তাঁর জীবনের সমস্ত কীর্তির পিছনেই এই নারীভক্তির ছাপ লক্ষ্য করা যাবে।

জননী সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের অনুভূতি ছিল সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। কারো মা নেই শুনলেই তিনি গলে পড়তেন। গানের মধ্যে মা-মা শুনলেও তিনি অবিরাম অশ্রুবর্ষণ করতেন। তিনি তাঁর দুই অকৃত্রিম সুহৃদ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মদনমোহন তর্কলঙ্কারের জননীকেও মা বলে ডাকতেন। তিনি যখন ভ্রাতাদের জন্য পৃথক পৃথক বাসস্থান নির্মাণ করান, তখন ভগবতী দেবীর থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন নিজের কাছে। তাছাড়া কারো মাতৃভক্তির কথা শুনলেও তিনি অকৃষ্ট হতেন। বেথুন সাহেবের মাতৃভক্তির কথা শুনেই তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। স্যার গুরুদাস সম্পর্কেও তিনি একস্থানে বলেছেন—'গুরুদাসের মাতৃভক্তি দেখিয়া আমি তাঁহাকে ভক্তি করি।'

ভগবতী দেবী ছিলেন ত্যাগের প্রতিমূর্তি। প্রথম জীবনে সচ্ছলতা না থাকলেও, তাঁর পুত্রেরা পরবর্তীকালে কৃতবিদ্য হন এবং সুপ্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। কিন্তু ত্যাগ এবং বৈরাগ্যেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। ধনসম্পদ বলতে তিনি বুঝতেন সুসন্তান। অলঙ্কার বলতে বুঝতেন—পরাপকার। বিদ্যাসাগর একবার জননীকে তিনটি অলঙ্কার দিত চাইলেও, ভগবতী দেবী তিনটি সামাজিক সেবার প্রস্তাব করেন। এই থেকেই পুত্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে ত্যাগ ও বৈরাজ্য সঞ্চারিত হয়।

বিদ্যাসাগর যেমন জননীকে দেবীজ্ঞানে পূজা করতেন, জননীরও তেমনি পুত্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে গর্বের সীমা পরিসীমা ছিল না। বিদ্যাসাগরের গর্ভধারিণী হিসেবে তিনি গর্ববোধ করতেন। কাশীতে বসবাসকালে প্রখ্যাত হিন্দী কবি হরিশচন্দ্র একবার ভগবতী দেবীকে বলেন—বিদ্যাসাগরের মায়ের হাতে রূপোর খাড়ু! ভগবতী দেবী তার জবাবে বলেন—সোনারূপায় কি

হবে! উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় এই হাতেই হাজার হাজার লোককে খাইয়েছি। সেটাই হল বিদ্যাসাগরের মায়ের হাতের শোভা! এই উক্তি থেকেই তাঁর অসাধারণত্ব উপলব্ধি করা যায়।

ভগবতী দেবীর গর্ভে সাত পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রই হলেন তাঁর প্রথম সন্তান। অপর-পুত্ররা হলেন—দীনবন্ধু, শম্ভুচন্দ্র, হরচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, শিবচন্দ্র, আর কন্যারা হলেন—মনোমোহিনী, দিগম্বরী ও মন্দাকিনী। তাঁর পুত্রদের মধ্যে অনেকেই সুপ্রতিষ্ঠা অর্জন করেন কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী কেউ হননি।

ভগবতী দেবীর জীবন ছিল আদর্শ আর্য নারীর মত। আদর্শ আর্য নারীর মতই ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথ অনুসরণ করে তিনি শেষ জীবনে কাশীবাসী হন। পৌত্র নারায়ণ চন্দ্রের বিয়ের কিছুদিন পরে ১২৭৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংক্রান্তিতে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ঠাকুরদাস তাঁর পাশেই ছিলেন এবং এই পূণ্যবতী নারী স্বামীর পদধূলি নিতে নিতে প্রাণত্যাগ করেন।

জননীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বিদ্যাসাগর শিশুর মত অধীরভাবে কেঁদে ওঠেন। তিনি তখন কাশীপুরের গঙ্গাতীরে বসবাস করতেন। সেখানেই মাতৃশ্রাদ্ধ করেন। জননীর মৃত্যুর পর তিনি এক বৎসরকাল সব রকম ভোগবিলাস পরিত্যাগ করে নিরামিষ স্বপাক ভোজন করতেন। পায়ে জুতো পরতেন না, ছাতা নিতেন না এবং মাটিতে শুতেন। ভগবতীদেবীর মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে ১২৮৩ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ ঠাকুরদাসও পরলোক গমন করেন।

বিদ্যাসাগরের বিশাল কর্মবহুল জীবনে জননীর স্থান ছিল সবার ওপরে। জননীকে তিনি কি চোখে দেখতেন, তা তাঁর একটি উক্তিতেই সুপরিস্ফুট—

'আমি যদি আমার মায়ের গুণরাশির শতাংশের একাংশ মাত্র পাইতাম, তাহা হইলে কৃতার্থ হইতাম। আমি এমন মায়ের সন্তান ইহা গৌরবের বিষয় মনে করি।'

বিদ্যাসাগরের জীবনকে এমন সার্থক এবং পুণ্যময় করে তুলতে ভগবতী দেবীর মত জননীরই প্রয়োজন ছিল। বিদ্যাসাগর যে দেশবাসীর আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধার উপহার 'দয়ার সাগর' আখ্যা লাভ করেছিলেন, এই গৌরব প্রাপ্তির অন্তরালেও ছিলেন জননী ভগবতী দেবী।

মধুসূদন-জননী জাহ্নবী দেবী

মাতৃভূমির যে পূণ্যস্রোতা কপোতাক্ষ নদকে নিয়ে কবি মদুসূদন লিখেছিলেন—'দুগ্ধ স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে', সেই কপোতাক্ষ নদের তীরেই তাঁর জন্মভূমি সাগরদাঁড়ি গ্রাম অবস্থিত। যশোহর জেলার সদর কার্যালয় থেকে সাগরদাঁড়ি খুব বেশী দূরে নয়। এই গ্রামে রামনিধি দত্ত নামে একজন প্রতিপত্তিশালী বিত্তবান পুরুষ বাস করতেন। যাঁর ছেলেরা হলেন—রাধামোহন, মদনমোহন, দেবীপ্রসাদ ও রাজনারায়ণ। শিক্ষা দীক্ষায় এঁরা সকলেই উপযুক্ত ছিলেন।

সবচেয়ে ছোট রাজনারায়ণ খুলনা জেলার কটিপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের রূপবতী কন্যা জাহ্নবী দেবীকে বিয়ে করেন। এঁরাই হলেন মধুসূদনের জনক-জননী। জাহ্নবী দেবীকে পরে রাজনারায়ণ আরও তিনটি বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু মধুসূদনই হলেন তাঁদের একমাত্র সন্তান। মধুসূদনের তিন জন বিমাতা হলেন—শিবসুন্দরী, প্রসন্নময়ী ও হরকামিনী। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী মধুসূদনের জন্ম হয়। সে সময় দত্ত পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই উন্নতিলাভ করে। তাছাড়া রাজনারায়ণ বাড়ির ছোট ছেলে বলে, মধুসূদনের খুবই আদর হয়। মধুসূদনের জন্মের পরে তাঁর আরও দুটি সহোদর জন্মায়—প্রসন্নকুমার ও মহেন্দ্রনারায়ণ নামে; কিন্তু তাঁরা কেউই দীর্ঘজীবী হয়নি। মধুসূদন তাই জনক-জননীর নয়নের মণি হয়ে ওঠেন।

জননী জাহ্নবী দেবীর স্বভাব ছিল অত্যন্ত কোমল। তিনি স্নেহপরায়ণা ছিলেন এবং পরদুঃখে সহজেই কাতর হতেন। স্বামীর তিনিও উদার হস্তে দান করতেন এবং আমোদ-আহ্লাদে অকাতরে অর্থব্যয় করতেন। স্বামী সেবাকে তিনি পরম ধর্ম বলে মনে করতেন এবং কখনও স্বামীর বিরুদ্ধাচারণ করতেন

না। তিনি জীবিত থাকতেও রাজনারায়ণ যে আরও তিনটি বিয়ে করেছিলেন, সেজন্যে স্বামীর ওপর তাঁর কোনরকম অশ্রদ্ধা ছিল না। গুণমুগ্ধ রাজনারায়ণ পত্নীদের মধ্যে জাহ্নবী দেবীকেই সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করতেন জাহ্নবী দেবীকে একবার একটি পত্রে তিনি লেখেন—'পৃথিবীতে দুইটি মাত্র লোকের নিকট আন্তরিক ভালবাসা পাওয়া যায়। এক জননী অপর সহধর্মিণী। আমার জননী স্বর্গে গিয়াছেন, কেবল তোমার জন্যই আমি সংসারাশ্রমে রহিয়াছি। যখন শুনিব, তোমার ভালবাসায় আমি বঞ্চিত হইয়াছি, তখনই এ সংসার ত্যাগ করিব।'

মধুসূদনের জীবনে যে উদারতা দেখা যায়, সে প্রশস্ত হৃদয়ের সন্ধান মেলে—সবই তিনি পেয়েছিলেন জননীর কাছ থেকে। তাঁর জীবনে সরলতা এবং প্রেম প্রবণতা জননীরই দান। জাহ্নবী দেবী ছিলেন সমস্ত ক্ষুদ্রতা-নীচতার উর্ধ্বে শৈশবে তিনিই মধুসূদনকে লালন-পালন করেন। জননীর কাছেই তাঁর অক্ষর পরিচয় হয় এবং গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষার সময়েও জননীই ছিলেন তাঁর প্রেরণাদাত্রী। পিতা রাজনারায়ণ ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী। বারো-তের বছর বয়সের সময় তিনি মধুসূদনকে কলকাতা নিয়ে এসে হিন্দু কলেজে ভর্তি করে দেন। তার আগে পর্যন্ত জননীর নির্দেশেই তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা পরিচালিত হত। যে রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্য দুটি তাঁর কাব্য-সাহিত্যকে ঐশ্বর্যশালিনী করেন, সে কাব্য দুটিও তিনি পড়েছিলেন জননীর কাছেই।

মধুসূদন প্রকৃত অর্থেই রূপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছিলেন। শৈশবে তিনি চান করতে গেলে পাছে আসতে দেরি হয়, এই আশঙ্কায় ছ-সাতটা হাঁড়িতে ভাত চাপানো হত। যে হাঁড়ির ভাত সুসিদ্ধ হত, সেটাই তিনি খেতেন। কিন্তু তাঁর জীবনে বোধহয় সুখের অধ্যায়টি ঐ পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল। পরবর্তী জীবনে ভাগ্যের পরিহাসে দুঃখের বোঝাটাই তাঁর কাছে গুরুভার হয়ে ওঠে। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও যে বস্তু থেকে তিনি কোনদিন বঞ্চিত হননি, সেটি মাতৃস্নেহ।

প্রকৃতপক্ষেই জাহ্নবী দেবী পুত্রস্নেহে আত্মহারা ছিলেন। মধুসূদন যখন

খ্রীষ্টধর্ম দীক্ষিত হন, তখন সামাজিক সংস্কারের ভিত্তিতেই তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হয়। জাহ্নবী দেবী তখন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে উন্মাদিনীর মত দিন কাটান। রাজনারায়ণ তাই নিরুপায় হয়ে গোপনে মধুসূদনকে বাড়িতে আসতে বলেন। পুত্রকে শুধুমাত্র চোখে দেখলেও শোকাতুর জননী শান্ত হতেন। জননীর আগ্রহে রাজনারায়ণ পুত্রকে আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত করতে পারেননি। পরবর্তীকালে পুত্রের আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে রাজনারায়ণ যখন আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেন, তখনও জাহ্নবী দেবী পুত্রকে লুকিয়ে লুকিয়ে সাহায্য করতেন।

কিন্তু আবেগ-প্রবণ কবি মাতৃস্নেহের যোগ্য প্রতিদান দিতে পারেননি। তাঁর কাব্য-সাহিত্যেও জননী অনুপস্থিত। কিন্তু জননীর ওপর তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা বা আকর্ষণ কিছু কম ছিল না। তাঁর আজীবন স্নেহ ভিক্ষা জননীর স্মৃতিরোমন্থন ছাড়া কিছু নয়। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা স্মরণ করাও মাতৃতর্পণেরই নামান্তর মাত্র। তাঁর মেঘনাদ বধ কাব্যের মেঘনাদ মাতৃবন্দনা করতে গিয়ে বলেছেন— 'কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি অশীছিলেন।' এ আত্মবিশ্বাস মধুসূদনেরই প্রতিধ্বনি। জননীর স্নেহ-হস্তের সুষমার সঙ্গে তিনি আবাল্য পরিচয় ছিলেন, সেই অনুভূতি তাঁর-কাব্যে একটি উপমায় ফুটে উঠেছে।

জননী যেমনি
খেদান মশক বৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
কর পদ্ম সঞ্চালনে।

জননীর ওপর তাঁর যে আত্মবিশ্বাস এবং নির্ভরতা ছিল, অন্তরালের সেই বিশ্বাসই প্রতিফলিত হয়েছে 'বঙ্গভাষা' কবিতায়—

নারিনু মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে অবোধ আমি, ডাকিলা যৌবনে
যদিও অধমপুত্র, মা কি ভুলে তারে?

বিদ্যাসাগরের চরিত্র-চিত্রণ করতে গিয়ে মধুসূদন একবার একটি চিঠিতে লিখেছিলেন the wisdom of an ancient Indian sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother. বাঙালী

জননীর অন্তকরণ কি, সে-আস্বাদ তিনি জাহ্নবী দেবীর কাছেই পেয়েছিলেন!

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের জীবনে সত্যিকারের দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। ঐ সময়ে উদ্দাম কবি পিতা মাতার যোগ্য প্রতিদান পর্যন্ত দেননি। জননী জাহ্নবী দেবী অভাগিনীর মত পুত্রের পথ চেয়ে দিন কাটিয়েছেন। আকুল আগ্রহে পুত্রের পথ চেয়েই তাঁকে ইহলোক ত্যাগ করতে হয়েছে (১৮৫১)। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন একবার কলকাতা এসেছিলেন। রাজনারায়ণ তখনও জীবিত; কিন্তু কবি দেখা করেননি। জাহ্নবী দেবীর মৃত্যুর চার পাঁচ বছর পরে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী রাজনারায়ণ পরলোকগমন করেন। মধুসূদনের মাদ্রাজ প্রবাসের তিন বছরের মধ্যেই একমাত্র পুত্রে ওপর বুকভরা বেদনা নিয়েই তাঁর জনক-জননীকে ইহলোক ত্যাগ করতে হয়েছিল।

দেরীতে হলেও, কবি এসব সংবাদ পেয়েছিলেন। স্নেহ-সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকলেও, জনক-জননীর মৃত্যুর সংবাদ তাঁকে কতটা ব্যথিত করেছিল বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখা একটি চিঠিতেই তা সুপরিস্ফুট—I know that my poor mother was no more but I never thought that I was an orphan in every sense of that word! কবি সম্ভবতঃ তখনই তাঁর অনাগত দুর্ভাগ্যের ভ্রুকুটি দেখতে পেয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন!

জনক-জননীর ওপর নিজের ব্যবহারও কবিকে সম্ভবত কিছুটা বেদনার্ত করে রেখেছিল। কিন্তু অশ্রু অর্ঘ্য ছাড়া পরবর্তী কালে তিনি তাঁদের কিছু দিতে পারেননি। খিদিরপুরের বসত বাড়িটি তিনি বিক্রি করেছিলেন বাল্যবন্ধু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। হরিমোহন এবং তাঁর অগ্রজ কবি রঙ্গলাল জাহ্নবী দেবীকে 'মা' বলে ডাকতেন। তাঁর বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় মধুসূদন একবার নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন; জগদ্ধাত্রীর দেবীমূর্তি দেখে তিনি কেঁদে জননীর উদ্দেশে বলেছিলেন—'মা', তোমার যোগ্যপুত্র তোমার গৃহ কেমন সাজাইয়াছে, আমি তোমার অযোগ্য সন্তান, আমার দ্বারা তোমার জননীর ওপর তাঁর অফুরন্ত ভক্তি এইভাবেই প্রকাশিত হত।

মধুসূদনের জনক-জননী তাঁদের প্রাণাধিক পুত্রের নিদারুণ দুর্ভাগ্য,

লোকোত্তর প্রতিভা কিংবা বঙ্গসাহিত্যে স্বর্ণ সিংহাসন লাভ কিছুই দেখে যেতে পারেননি। তাঁদের স্বর্গারোহণের পর মধুসূদনের জীবনও 'দিনদিন আয়ুহীন হীনবল দিনদিন' হয়ে উঠেছিল। জীবনের অন্তিমলগ্নে কবি যখন নিজেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তখন তিনি রিক্ত, নিঃস্ব। এক একটি করে পালক জমে শুধু খ্যাতির মুকুটটাই পাহাড়-সদৃশ হয়ে উঠেছিল। কাব্যে-সাহিত্যে স্মরণ না করলেও, কবি তাঁর সমাধি-লিপিতে জনক-জননীকে অমর করে রেখেছেন। অনাদিকালের বঙ্গবাসীকে ডেকে তাঁর আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছেন—

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে। তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পরে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ি কপোতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ, নামে, জননী-জাহ্নবী।

এই আন্তরিক প্রকাশভঙ্গির তুলনা হয় না; অনন্য, একক।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জননী চন্দ্রাদেবী

হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে এক দরিদ্র মহাতেজা ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ব্রাহ্মণের নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। গৃহ দেবতা রঘুবীরের আরাধনা নিয়েই তিনি দিন কাটাতেন। ধর্মনিষ্ঠ এই ব্রাহ্মণ যথার্থ অর্থেই শুদ্ধসত্ত্ব ছিলেন।

মধ্য যৌবনেই ক্ষুদিরামের পত্নীবিয়োগ হয়। প্রথমা পত্নী নিঃসন্তান ছিলেন বলে তিনি চল্লিশ বছর বয়সে আবা বিয়ে করেন। কন্যা হলেন সরাটি-মায়াপুর গ্রামের এক সরলা বালিকা চন্দ্রমনি—চন্দ্রাদেবী নামেই যিনি সমধিক খ্যাত ছিলেন। ১২০৫ বঙ্গাব্দে ক্ষুদিরাম পত্নীরূপে বরণ করে আনলেন অষ্টম বর্ষীয়া সেই বালিকাকে।

বালিকা-বধূ শুধু বয়সেই ছোট ছিলেন না, সংসার-জীবনেও অনভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি এমন সরল ছিলেন যে, মিথ্যা কাকে বলে জানতেন না। বুঝতে পারতেন না, কেন লোকে মিথ্যা কথা বলে, কেন ছলনার আশ্রয় নেয়! আশপাশের লোকেরা তাই চন্দ্রাদেবীকে হাবাগোবা বলতে লাগল।

কিন্তু খুশি হলেন ক্ষুদিরাম নিজে। তাঁর পুণ্য জীবনে সঙ্গী হিসেবে এমন সরলা রমণীরই প্রয়োজন ছিল। আস্তে আস্তে তিনি তাঁকে গড়ে তুলতে লাগলেন। দয়াময়ী শুধু দেব সেবাতেই নয়, জীব সেবাতেও উৎসাহী হলেন। দুয়ারে আর কেউ অভুক্ত আছে কিনা জেনে তবে তিনি অন্নজল মুখে তুলতেন। গরীব দুঃখীরাও তাই তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। তারা তাঁর কাছে নিজেদের দুঃখকষ্টের কথা বলতেন, চন্দ্রাদেবী সাশ্রুলোচনে সে সব কথা শুনতেন।

ধীরে ধীরে ক্ষুদিরামের সংসারে চন্দ্রাদেবী সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে উঠলেন। ক্ষুদিরাম পরম তৃপ্তিতে দিন কাটাতে লাগলো। চন্দ্রাদেবী চারটি সন্তানের জননী হলেন—তিন পুত্র আর এক কন্যা; রামকুমার, রামেশ্বর, রামকৃষ্ণ আর কাত্যায়ণী। সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করে পুণ্যময় করে তুললেন জনক-জননীর মর্ত্যলোকের অধিবাসকে।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ঘর হলেও ক্ষুদিরাম বিশেষ জাত-বিচার মানতেন না। গৃহবধূ চন্দ্রাদেবীর তাই সব সময়ের সঙ্গী হলেন দুই সখী। দু'জনেই অব্রাহ্মণ এবং তথাকথিত নীচ সম্প্রদায়ভুক্ত। একজন ধনী কামারণী, আর একজন হলেন প্রসন্নময়ী নামে এক বালবিধবা। চন্দ্রাদেবীও জাতি-ধর্মকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। মানুষের মধ্যে প্রাণের ঠাকুরকেই তিনি অধিক শ্রদ্ধা করতেন।

চন্দ্রাদেবীর কনিষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণের বাল্য নাম ছিল গদাধর, সংক্ষেপে গদাই। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। বাঙালীর ইতিহাসে তাঁর জন্মদিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রামকৃষ্ণের জন্মলগ্নে চন্দ্রাদেবী অনেক কিছু অলৌকিক নিদর্শন লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু কারো কাছে সেকথা প্রকাশ করলেন না।

চন্দ্রাদেবীর পুত্র সন্তান হয়েছে শুনে ধনী কামারনী ছুটে এসে কোলে তুলে নিলেন প্রিয় সখীর সদ্যজাত শিশুটিকে। শূদ্রানীর কোলে শিশুপুত্রকে দেখে অনেক সংস্কারগ্রস্ত গ্রামবাসী শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু জনক জননীর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই সেদিকে। জীবে প্রেম করার জন্যে যাঁর দেহ ধারণ, তাঁর আবার ভেদাভেদ বোধ কি! বাবা-মায়ের প্রশ্রয়ে বালক গধাধর, গ্রামের শেষ প্রান্তে ধনী কামারনীর কুটীরে গিয়ে ভাত খেয়ে আসতে লাগলেন। জনক-জননীর কাছেই সন্তানের দীক্ষা হল মানব প্রেমের।

রামকৃষ্ণের উপনয়নের সময়েও আবার গোলযোগ দেখা দিল। ধনী কামারনী রামকৃষ্ণের ভিক্ষামাতা হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গ্রামবাসীদের তাতে ঘোর আপত্তি। এবার রামকুমারও তাঁদের পক্ষে। কিন্তু চন্দ্রাদেবী নির্বিকার। জৈষ্ঠপুত্রকে বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি রাজী করালেন। নিঃসন্তান

ধনী কামারনী রামকৃষ্ণকে সন্তানরূপে গ্রহণ করলেন। তিনি হলেন রামকৃষ্ণের দ্বিতীয়া জননী। রামকৃষ্ণের কণ্ঠে মা ডাক শুনে তাঁর সে কি আনন্দ।

ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণের বয়স যখন সাত বছর, তখন ক্ষুদিরাম ইহলোক ত্যাগ করলেন। রামকৃষ্ণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তো তো তাঁর মর্ত্যলোকের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। বালক গদাধরের কিন্তু সে বিষয়ে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি সেই সারাদিন খেলা আর যাত্রা থিয়েটার দেখেই বেড়াতে লাগলেন। জননী চন্দ্রাদেবী তবু পুত্রকে কিছু বললেন না, সন্তানেরর পরিণতির কথা যেন তিনি সবই জানতেন। ক্ষুদিরামের মৃত্যুর পর তিনি তখন একধারে পিতা, অন্যদিকে মাতা। তবু তিনি পুত্রকে তাঁর নিজের ইচ্ছাতেই বিকশিত হতে দিলেন।

গদাধরের সংসারে মতিগতি ফেরানোর জন্যে শেষ পর্যন্ত জননীর যা শেষ অস্ত্র, চন্দ্রাদেবী তাই প্রয়োগ করলেন। রামকৃষ্ণের বিয়ে দিয়ে সারদা দেবীকে আনলেন পুত্রবধূ করে। মেয়ের যেমন রূপ, তেমনি গুণ। কিন্তু রামকৃষ্ণ যে ভোলানাথ, সেই ভোলানাথই রয়ে গেলেন। তিনি তখন দেবতাকে প্রিয় করার সাধনাতেই বিভোর। শুধঞ অন্বেষণ, দিনে-রাতে, শয়নে-স্বপনে শুধু এক ধ্যান, এক চিন্তা।

পুত্রের এই তন্ময়তা ক্রমশই বাড়তে লাগল। চন্দ্রাদেবী পাগলের মত অধীর হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত পুত্রের আরোগ্য কামনা করে মুকুন্দপুরের শিবমন্দিরে গিয়ে হত্যে দিয়ে পড়লেন। পুত্রের রোগ মুক্তি হল। জননী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

কিন্তু বাবা বিনামেঘে বজ্রাঘাত। ক্ষুদিরামের মৃত্যুতে সংসার তখনও টাল-মাটাল, এমন সময় দেহরক্ষা করলেন পুত্র রামকুমার। জননীর কথা ভেবে গদাধর, বিচলিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু চন্দ্রাদেবী অনড়, নিশ্চল। গদাইকে ডেকে তিনিই বললেন—সংসার অনিত্য, সকলকেই একদিন যেতে হবে। তার জন্যে শোক করা বৃথা। জননীর এই উপলব্ধিতে মুগ্ধ হলেন পুত্র গদাধর।

একই উপলব্ধিতে তখন গদাধরও অস্থির। তিনি তখন ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছেন পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রূপে। অগ্রজের হাত ধরে একদিন তিনি

দক্ষিণেশ্বরের এসেছিলেন পূজারী ব্রাহ্মণ হিসেবে। রানী রাসমণি ভবতারিণীর মন্দির নির্মাণ করে তাঁকেও প্রতিষ্ঠিত করলেন। ধীরে ধীরে বিকশিত হল দিব্যমানবের চিত্ত শতদল। দক্ষিরেশ্বরেই থেকে গেলেন রামকৃষ্ণ দেব। সারদা দেবী এলেন, জননী চন্দ্রাদেবীকেও আনা হল। উপলক্ষ হল রাণীর জামাতা মথুর বাবুর অন্নমেরু উৎসব। জীবনের শেষ বারোটি বছর চন্দ্রাদেবী এখানেই কাটালেন।

দয়া-ময়া সদাচার ছাড়া চন্দ্রাদেবীর জীবনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল বৈরাগ্য। পাথির্ব কোন বিষয় সুখে তাঁর মন ছিল না। একবার মথুর বাবু তাঁকে বলেন—ঠাকুমার, তুমি তো আমার কাছে কোনোদিন কিছু চাইলে না। যদি সত্যি তুমি আমাকে ভালবাস, তাহলে যা ইচ্ছা তোমার চেয়ে নাও।

চন্দ্রাদেবী হেসে বলেন—আমার তো কোন অভাব নেই ভাই। তবে মুখে দেবার গুল ফুরিয়ে গেছে, এক আনার দোক্তা এনে দিও।

এই বৈরাগ্য থেকেই যুগমানব রামকৃষ্ণের জন্ম। জননী এমন সদাপ্রসন্নময়ী না হলে, সন্তান এমন হবে কি করে! রামকৃষ্ণদেবের পার্থিব আধার তো জননী চন্দ্রাদেবীই!

চন্দ্রাদেবী-সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। মৃত্যুর কিছু আগে তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়। দক্ষিণেশ্বরের কাছে যে আলমবাজার ওখানকার পাটকলে সিটি বাজলে তিনি বলতেন, ঐ বৈকুণ্ঠের শঙ্খধ্বনি হল। এই শব্দ না শোনা পর্যন্ত তিনি খেতে চাইতেন না। অনুরোধ করলে বলতেন, লক্ষ্মীনারায়ণের এখনও সেবা হয়নি, বৈকুণ্ঠে এখনও শঙ্খ বাজেনি, খেতে আছে নাকি।

দক্ষিণেশ্বরে নহবত খানার দোতলার ছোট ঘরটিতে তিনি থাকতেন। রামকৃষ্ণদেব রোজ সকালে জননীকে প্রণাম করতেন। জননীর সেবা যত্নের জন্যে তিনি একজন পরিচারিকাও রেখেছিলেন। মৃত্যুর আগেও তিনি জননীর পদপ্রান্তে বসে তাঁর সেবা করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে অন্য কোথাও গেলে তিনি জননীর জন্যে ব্যাকুল হতেন। একবার বৃন্দাবনে গিয়ে জননীর কথা মনে পড়তে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন।

পঁচাশি বছর বয়সে পুত্র রামকৃষ্ণের জন্মদিনে এই পুণ্যবতী জননী দেহত্যাগ

করেন। সেই দিনটি হল—১৬ই ফাল্গুন, ১২৮২ বঙ্গাব্দ। অর্ন্তজলি করার সময় রামকৃষ্ণদেব ফুল-চন্দন-তুলসী দিয়ে জননীর পাদপদ্মে অঞ্জলি দেন। তারপর তাঁরই নির্দেশে ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চন্দ্রাদেবীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন।

পুত্রের ওপর জননীর অগাধ আস্থা ছিল। কন্যাতুল্য পুত্রবধূর গা থেকে অন্যের অলঙ্কার খুলে নেবার সময় একবার তিনি বলেছিলেন—গদাই তোমাকে এর চেয়েও ভালো গয়না আরো কত দেবে!

জননীর কথা মিথ্যে হয়নি। পরবর্তীকালে শুধু সারদাদেবীই নন, সমগ্র মানবজাতি জননীর সেই সার্থক দৈববাণীর অলৌকিক রূপায়নে কৃতার্থ হয়েছে!

হেমচন্দ্র-জননী আনন্দময়ী দেবী

বাঙালী মনীষীদের মধ্যে যাঁদের জীবন গঠিত হয়েছিল জননীর প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং সাহচর্যে, তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার-জননী দয়াময়ী দেবী, গুরুদাস-জননী সেনামণি দেবী এবং হেমচন্দ্র-জননী আনন্দময়ী দেবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আনন্দময়ী দেবী রূপে গুণে, স্বভাবে-প্রকৃতিতে সত্যি সত্যিই আনন্দময়ী ছিলেন।

হুগলি জেলার রাজবলহাটের রাজচন্দ্র চক্রবর্তী হলেন আনন্দময়ী দেবীর পিতা। রাজচন্দ্রের আনন্দময়ীই ছিলেন একমাত্র সন্তান। সম্ভবতঃ সেই কারনেই তিনি কন্যাকে পাত্রস্থ করে ঘরজামাই করে রেখেছিলেন। আনন্দময়ীর স্বামী কৈলাসচন্দ্র ঘরজামাই থেকেও স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে বাস করেছেন, তাঁকে কোন অমর্যাদাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি।

রাজচন্দ্র কলকাতার খিদিরপুর অঞ্চলে মোক্তারী করতেন, সেখানে ছোটখাট তাঁর একখানি বাড়িও ছিল। মোক্তারী ছাড়া রাজচন্দ্রের রাজবলহাটে কিছু জমিজমা ছিল, শিষ্য-যজমান থেকেও তাঁর কিছু কিছু আয় হত। তিনি বেশ আমুদে প্রকৃতি মানুষ ছিলেন, বাড়িতে ঘটা করে পূজো-আর্চা করতেন, নাতি-নাতনীদের নিয়ে আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাতেন। সেই সব সুখের দিনগুলি স্মরণ করে হেমচন্দ্র পরবর্তীকালে একটি কবিতায় লিখেছেন—

আদরে লালিত আদরে পালিত,
মাতাম'র আর ছিল না কেহ,
অগত্যা তাঁহার আমাদেরই প্রতি,
ছিল অশৈশব অধিক স্নেহ।

কৈলাসচন্দ্র কোন কাজ না করলেও, আনন্দময়ী দেবীর কোন অভাব ছিল না। পিত্রালয়ে তিনি সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই দিন কাটাচ্ছিলেন।

কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাত হল। রাজচন্দ্র হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হলেন এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিপদে পড়লেন আনন্দময়ী দেবী। দারিদ্র্য কী তিনি জানতেন না, এবারে তার মুখোমুখি হলেন।

রাজচন্দ্রের মৃত্যুর সময় আনন্দময়ী দেবী কলকাতায় বাস করতেন। জ্যেষ্ঠপুত্র হেমচন্দ্রের পড়াশোনা তখন সবে শুরু হয়েছে। বিনামেঘে বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। পাঁচ-ছটি ছেলে মেয়ের ভরণ পোষণের জন্যে কৈলাসচন্দ্রকে ঘোড়ার গাড়ির ব্যবসা করতে হল। বালক হেমচন্দ্রের পড়াশোনাও বন্ধ হয়ে গেল। দারিদ্র-লাঞ্ছিত পিতামাতা নাবালক পুত্রের উপার্জন করার কথা ভাবতে লাগলেন।

সংস্কৃত কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যক্ষ প্রসন্ন কুমার সর্বাধিকারী সে সময় খিদিরপুরেই থাকতেন। তাঁর সঙ্গে অনেক সাহেব-সুবোর আলাপ, তিনি ইচ্ছে করলে হেমচন্দ্রে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, তাছাড়া প্রসন্ন কুমার মানুষ হিসেবেও পরোপকারী ছিলেন। আনন্দময়ী দেবী সেই অভিপ্রায়ে একদিন বালক পুত্রের হাত ধরে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

হেমচন্দ্রের চোখে মুখে প্রতিভার আভা প্রসন্নকুমারের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না, তিনি চাকরীর পরিবর্তে হেমচন্দ্রের শিক্ষাদীক্ষার সব ভার নিলেন। হেমচন্দ্র অচিরেই পড়াশোনায় তাঁর মেধার পরিচয় দিলেন। পড়াশোনায় উত্তরোত্তর উন্নতিতেও তাঁর প্রেরণার উৎস ছিলেন জননী আনন্দময়ী দেবী। পড়াশোনার কষ্ট লাঘব করার জন্যে তিনি পুত্রের শিয়রে বসে অবিরাম পাখার হাওয়া করতেন।

আনন্দময়ী দেবী মানুষ হিসাবে ছিলেন অত্যন্ত সরল এবং ধর্মপরায়ণা। অপরের দুঃখকষ্ট দেখলে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। ভিক্ষুক এবং অতিথিদের তিনি দেবতাজ্ঞানে সেবা করতেন। হেমচন্দ্র পরবর্তীকালে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন, তখন আনন্দময়ী দেবী গরীব দুঃখীদের দু'হাতে দান করতেন। তাঁর এই প্রকৃতিটি পুত্র হেমচন্দ্রও লাভ করেছিলেন। হেমচন্দ্রকে যে চক্ষুহীন অবস্থায় অসহনীয় অর্থকষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল, তার মূলে তাঁর বল্গাহীন দানধ্যানও একটি কারণ ছিল।

আনন্দময়ী দেবীর পুত্র এবং দুই কন্যা। পুত্রেরা তাঁর সকলেই কৃতবিদ্য

ছিলেন। জ্যেষ্ঠ হেমচন্দ্র ছাড়া, তার কনিষ্ঠ পুত্র ঈশানচন্দ্রও কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। 'যোগেশ কাব্য' তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আনন্দময়ী দেবীর দ্বিতীয় পুত্র পূর্ণচন্দ্র খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন, আর যোগেন্দ্র চন্দ্র পূর্ণ বিকাশের আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আনন্দময়ী দেবী দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে কিছুদিন কাটালেও, তিনি পুত্রদের সৌভাগ্য-সুখ দেখে গেছেন। কবি এবং ব্যবহারজীবী হিসেবে হেমচন্দ্রর দেশব্যাপী খ্যাতি দেখে তিনি যে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন, সেকথা বলাই বাহুল্য। দ্বারকানাথ মিত্রের অকাল মৃত্যুতে হেমচন্দ্রের জজ হবারও সুযোগ এসেছিল, কিন্তু আনন্দময়ী দেবীর আপত্তিতে হেমচন্দ্র জজ হতে পারেননি। স্নেহময়ী জননী দ্বারকানাথের অকাল-মৃত্যু দেখে ভয় পেয়ে গেছিলেন। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, বাঙালী হাইকোর্টের জজ হলে অল্পদিনেই মারা যাবেন।

জননীর কাছে বহু সদ্‌গুণ লাভ করেছিলেন হেমচন্দ্র। জননীর স্নেহ ছিল তাঁর জীবনে পিতার আশীর্ব্বাদের মত। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, জননী এবং জন্মভূমি 'গুরুত্ব গৌরবে দুই অতুলন।' চিত্ত-বিকাশ' কাব্যে হেমচন্দ্র লিখেছেন—

জননীর স্তনক্ষীরের আস্বাদ,
একবার জিহ্বা জুড়ায় যার,
যে জেনেছে বাল্যক্রীড়ার আহ্লাদ।
জগতে কিছু কি চায় সে আর।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আনন্দময়ী দেবী দেহত্যাগ করেন। মাতৃশ্রাদ্ধে হেমচন্দ্রর অকাতরে অর্থব্যয় করেছিলেন, জননীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তিনি গঙ্গায় একটি ঘাট নির্মাণ করান।

মাতৃশোকে হেমচন্দ্র যথার্থ অর্থে ভেঙে পড়েছিলেন। শান্তিলাভের আশায় তীর্থে তীর্থে তিনি ঘুরে বেড়ান, কিন্তু মাতৃশোক ভুলতে পারেননি। জননীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং আকর্ষণ এমনই আন্তরিক ছিল।

বঙ্কিম-জননী দুর্গা দেবী

বঙ্কিম-জননী দুর্গা দেবী রত্নাগর্ভা ছিলেন। তাঁর চার পুত্র—শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, এবং পূর্ণচন্দ্র সকলেই কৃতী ছিলেন। তার মধ্যে সাহিত্য স্রষ্টা হিসাবে সঞ্জীবচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র অমরত্ব লাভ করেছেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জননী হিসেবে বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি বঙ্কিমজননীর কাছে গভীর ভাবে ঋণী।

দুর্গা দেবীর পিতৃদেব ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণ ছিলেন একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। দুর্গা দেবীও ছিলেন বিদ্যানুরাগিনী। যাদবচন্দ্রে সঙ্গে যকন তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন তিনি বালিকা-মাত্র। যাদবচন্দ্রের প্রথমা পত্নী নিঃসন্তান অবস্তায় অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হলে, তিনি দুর্গা দেবীকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেন। লক্ষ্মীস্বরূপিনী পত্নীকে পেয়ে যাদবচন্দ্রে জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরম বৈষ্ণব যাদবচন্দ্রের এমন ধর্মপ্রাণা পত্নীরই প্রয়োজন ছিল।

দুর্গা দেবীর বহিরাবরণ সম্পর্কে তাঁর জ্যেষ্ঠ পৌত্র শচীশচন্দ্র একস্থানে লিখেছেন—'বঙ্কিমচন্দ্রের মাতা সাতিশয় স্থূলাঙ্গী ও কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। কিন্তু এমন করুণাময়ী শান্ত মূর্তি জগতে অল্পই দৃষ্ট হয়।'

দুর্গা দেবী সত্যি সত্যিই করুণাময়ী ছিলেন। তাঁর স্নেহময়ী চরিত্রের জন্য তিনি সকলের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু দীনবন্ধু-পুত্র ললিতচন্দ্র তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন—'তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিনী ছিলেন এবং গ্রামস্থ সকলেই তাঁহাকে পূজা করিতেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।'

সম্ভবতঃ অত্যন্ত কোমল স্বভাবের জন্যই তিনি পুত্রদের যথার্থ শাসন করতে পারতেন না। পুত্ররাও নিজেদের ইচ্ছেমত চলাফেরা করতেন। এর কিছুটা প্রভাব খারাপ হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—'কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হয়েছিল। বাপ থাকতেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে শিক্ষা যত্ন কিছু হয়নি। নীতিশিক্ষা কখন হয়নি।'

কিন্তু তাঁর স্নেহ সুধায় পরিপূর্ণ পুত্রদের মধ্যে কিভাবে সঞ্চারিত করেছিল, তাঁর দুই সুযোগ্য পুত্র তার নমুনা রেখেছেন। সঞ্জীবচন্দ্র লিখেছেন—'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃ ক্রোড়ে।' আর বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'শিশু মা'র কোলে উঠিলে মা'কে সর্বাঙ্গসুন্দর দেখে।'

পিতামাতার প্রতি বঙ্কিম-ভ্রাতাদের অপরিসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁর প্রথম কর্মস্থল অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন একটি শিশিতে তিনি জননীর পায়ের ধোয়া জল নিয়েছিলেন। যে-জলে বঙ্কিম-জননী পা ধোয়া হয়েছিল, সেটি ছিল গঙ্গাজল। বুঝতে পেরে দুর্গা দেবী শশব্যস্ত হয়ে বলেছিলেন—বাবা বঙ্কিম, একি করলি! গঙ্গাজল পায়ে ঠেকালি! বঙ্কিমচন্দ্র ছল ছল নয়নে জননীকে উত্তর দিয়েছিলেন—মা, আমার কাছে কি তোমার চেয়ে গঙ্গা বড়?

বঙ্কিম-ভ্রাতারা পিতৃদেবকে দিয়ে যেমন একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, জননীর নামে তেমনি একটি রথ প্রবর্তন করেন। রথযাত্রার দুটি দিনেই বঙ্কিম-জননী প্রথম দড়িটি স্পর্শ করতেন, তারপর অন্য সকলে টেনে নিয়ে যেত। বঙ্কিম-জননী মৃত্যুর পর বাড়ির কোন বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলা দাড়িটি স্পর্শ করে দিয়ে যাত্রা শুরু করাতেন।

জননীর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাবশত বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে লিখেছিলেন—'যে মনুষ্য জননীকে স্বর্গাদপি গরীয়সী মনে করিতেন না পারে, সে মনুষ্যমধ্যে হতভাগ্যঃ'।

বঙ্কিমচন্দ্র সত্যি সত্যিই জননীকে স্বর্গাদপি গরীয়সী করে তুলেছিলেন। তাঁর এই অনুভূতিই উত্তরকালে দেশমাতৃকার চরণে অর্পিত হয়েছিল। তাঁর 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের মধ্যে জননী শাশ্বত মর্যাদা লাভ করেছেন এটাই তাঁর উপযুক্ত মাতৃস্তুতি।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ ভাগে দুর্গা দেবী স্বর্গারোহন করেন। পুত্ররা সকলেই তখন প্রতিষ্ঠিত, স্ব-স্ব ক্ষেত্রে মহীয়ান। জননীর মৃত্যুর সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ছিলেন, সংবাদ পেয়ে বাড়িতে আসেন এবং ভক্তি ভরে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু জগদীশনাথ রায় বঙ্কিম-জননীকে মা বলে ডাকতেন, তিনিও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কাছা গলায় দিয়েছিলেন।

লক্ষ্মীস্বরূপিনী পত্নীর মৃত্যুতে যাদবচন্দ্র খুবই আঘাত পান এবং শান্তিলাভের জন্য তীর্থ পর্যটনে যান। পত্নী বিয়োগের পর যাদবচন্দ্র তাঁর স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে আরও দশ বছর জীবিত ছিলেন।

কেশব-জননী সারদাসুন্দরী দেবী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে যাঁকে 'সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণ সকলে ভূষিত' বলে অভিহিত করেছেন, সেই মহামানব কেশবচন্দ্র সেনের গর্ভধারিণী সারদাসুন্দরী দেবী বাংলাদেশে একজন আদর্শস্থানীয়া জননী ছিলেন। সারদাসুন্দরী দেবী ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবেণীতে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিত্রালয় ছিল ২৪ পরগণা জেলার গৌরীসভা গ্রামে। পিতা গৌরহরিদাস ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ; শক্তি মন্ত্রোপাসক। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। তাঁর চার কন্যা এবং পুত্রের মধ্যে সারদাসুন্দরী ছিলেন তৃতীয়।

সারদাসুন্দরীর জন্ম যে ত্রিবেণীতে, তার কাছাকাছি গরিফা গ্রামের সেন পরিবার ছিল সুবিখ্যাত তাঁরা রাজা বল্লালসেনের বংশধর বলেও প্রসিদ্ধ আছে। এই পরিবারের রামকমল সেন কলকাতা কলুটোলা অঞ্চলে সেন পরিবারের প্রতিষ্ঠা করেন। সেকাল বাংলাদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির এমন কোন শুভ কাজ অনুষ্ঠিত হয়নি, যাতে রামকমলের কোন অবদান ছিল না। হিন্দুকলেজ, সংস্কৃত কলেজ এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলেও তিনি ছিলেন মধ্যমণি। তাঁর ইংরেজী-বাংলা অভিধান আজও একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত।

রামকমলের চার পুত্র—হরিমোহন, প্যারীমোহন, বংশীধর ও মুরলীধর।

দ্বিতীয়পুত্র প্যারীমোহন ছিলেন প্রিয়দর্শন, দয়ার্দ্রচিত্ত একজন সহৃদয় পুরুষ। তিনি বিচক্ষণ, অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন। প্রতিদিন ভোর চারটের সময় উঠে তিনি হরিনাম করতেন। ইংরেজী-বাংলা সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। গান-বাজনায় তাঁর 'দক্ষতা' ছিল, তিনি সেতার-এসরাজ এবং পাখোয়াজ বাজাতে পারতেন। তিনি ছবি আঁকতে পারতেন এবং হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মত।

এই প্যারীমোহনের সঙ্গেই সারদাসুন্দরীর শুভপরিণয় হয়। ন'বছরের বালিকা সারদাসুন্দরী সেদিন কার গলায় মাল্য দিয়েছিলেন, বধূ হয়ে এসেছিলেন কোন্ পরিবারে—এসব অনুভূতি সেদিন তাঁর হয়নি। হবার কথাও নয়। বিয়ের একবছর পরে তিনি পতিগৃহের বিশাল প্রাসাদে আসেন সংসার করতে। তাঁর সে সময়ের অনুভূতির কথা তিনি নিজেই 'আত্মকথায়' সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন—'শ্বশুরবাড়ি আসিবার পূর্বে আমার বড় ভয় হত, মনে হইত, কোথায় যাইব। ভাবিতাম যেন কয়েদ করিবে, কিংবা ফাঁসি দিবে। এই ভাবিয়া একমাস পর্যন্ত কাঁদিয়াছিলাম। শেষে আমার বাবা জোর করিয়া যখন শ্বশুরবাড়ি রাখিয়া গেলেন তখন মনে হইল যেন আমায় জলে ফেলিয়া দিলেন। যদিও বহু দিন হইতে মনে করিতাম, আমাদের এই সব হিন্দু নিয়ম খুব ভাল, কিন্তু এখন দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, বেশ বড় হইয়া বিবাহ হইলেই ভাল; কেন না, তাহা হইলে আর এই সব কষ্ট করিতে হয় না। প্রথম শ্বশুর বাড়ি আসিয়া যখন এক একজনের মুখপানে চাইতাম, আমার এক এক পোয়া করিয়া রক্ত শুকাইয়া যাইত। ভয় হইত, কে কি বলিবেন। আমি তিন সন্তানের মা হইলাম, তখন পর্যন্ত আমার ভয় ছিল।

শ্বশুরালয়ে ভয় পেলেও, সারদাসুন্দরী দেবী শ্বশুরের কাছে পেয়েছিলেন অফুরন্ত স্নেহ। বিয়ের পর যে এক বছর তিনি পিত্রালয়ে ছিলেন, সে সময় প্রত্যেক রবিবারের রামকল পুত্রবধূকে দেখতে যেতেন। রামকমল ছিলেন পরম বৈষ্ণব, তিনি পুত্রবধূকেও হরিনামের মালা দিয়ে ঈশ্বর সাধনায় আগ্রহী করে তোলেন। রামকমলের প্রভাবেই মর্তজীবনের সমস্ত মঙ্গলময় দিকগুলি বালিকাবধূর চিত্তে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠে।

স্বামী প্যারিমোহনকে পেয়েও সারদাসুন্দরীর জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সুশিক্ষিত, মার্জিত প্যারীমোহন সহধর্মিণীকেও শিক্ষিত করে তুলতে আগ্রহী হন। শেষে কোন উপায় না দেখে তিনি নিজেই রাত্রে তাঁকে পড়াতে শুরু করেন। বিবাহিত জীবনের অল্প সময়ের মধ্যে সারদাসুন্দরী দেবী স্বামীর কাছ থেকে অনেক সুশিক্ষা লাভ করেছিলেন। একে একে তাঁর তিন পুত্র এবং চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেন—নবীনচন্দ্র, ব্রজেশ্বরী, কেশবচন্দ্র, ফুলেশ্বরী, চুন্নী, পান্না ও কৃষ্ণবিহারী। সুখ ও সৌভাগ্যের ভাণ্ড যেন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কিন্তু দুভার্গ্যের নিদারুণ আঘাত অপেক্ষা করেছিল অদূরেই। অল্প কয়েক দিনের অসুস্থতায় মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে প্যারীমোহন দেহত্যাগ করলেন। সেটা ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ, সর্বকনিষ্ঠ কৃষ্ণবিহারীর বয়স তখনও এক বছর হয়নি। অন্য ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট। নাবালক পুত্রকন্যাদের নিয়ে অকূল পাথারে পড়লেন সারদাসুন্দরী। তখন তাঁর বয়স মাত্র সাতাশ বছর।

কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েও সারদাসুন্দরী কিন্তু ভেসে গেলেন না। সংসারে অপরিসীম কষ্ট সহ্য করে, জীবনের মহত্ত্ব ও স্বর্গীয় চরিত্র রক্ষা করে তিনি আদর্শ জননী রূপে নিজেকে প্রকাশ করলেন। অভিভাবকদের অধীনে বাস করে, পূজা-আহ্নিক, ব্রত-উপবাস, তীর্থভ্রমণ, সাধুসঙ্গ, দরিদ্র নারায়ণের সেবা ইত্যাদিতে জীবন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু সংসারের সব কাজেও ছিল সমান অনুরাগ। পুত্রদের সুশিক্ষা দিতেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নবীনচন্দ্র, কেশবচন্দ্র ও কৃষ্ণবিহারীর মত প্রতিভাধর জননীর ছত্রছায়াতেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন।

সারদাসুন্দরী ছিলেন রমনী। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী ও গুণবতী মহিলা। তাঁর পূত চরিত্রের মাধুর্য, ভগবানে বিশ্বাস এবং অপত্যস্নেহ ছিল কিংবদন্তীর মত। তিনি সত্যপরায়ণা ছিলেন, কিন্তু সত্যকে তিনি এমন ভাবে প্রকাশ করতেন, যাতে তার দ্বারা অন্য কারো মনে আঘাত না লাগে। তিনি ছিলেন দয়ার প্রতিমূর্তি; চাকর চাকরাণীদের ওপরেও তাঁর এমন করুণা ছিল যে,

তিনি তাদের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তাদের কাজে সাহায্য করতেন। তিনি আজীবন ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন, উপাসনার সময় তিনি প্রতিদিন যে ব্রহ্ম সঙ্গীতটি গাইতেন, তার মধ্যে সারদাসুন্দরীর মনোভাব প্রতিফলিত —

কাতরে তোমায় ডাকি দয়াময়
হইয়ে সদয়, দাও দরশন।
পুরাও মন সাধ, ঘুচাও হে বিষাদ।
দিয়ে সুশীতল অভয় চরণ।

সারদাসুন্দরী দেবীর সাহিত্য রসবোধও যে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ের ছিল, মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর 'আত্মকথা' (১৯১৪) গ্রন্থটিই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

কেশবচন্দ্রের পূত চরিত্র গঠনে সারদাসুন্দরী দেবী যে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, সেকথা বলাই বাহুল্য। তাঁর 'আত্মকথা'র লিপিকার যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীরের মন্তব্য এ বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ—'সারদাসুন্দরী যদি মাতারূপে কেশবের ধর্মকে পূর্ণ জাতীয়ভাবে বরণ করিয়া না লইতেন, তাহা হইলে এই চির সত্য নব ধর্মকে আমরা হয়তো অন্য সাজে সজ্জিত দেখিতাম।' পূর্ণ প্রকাশিত কেশবচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করার পর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবও একদিন সারদা সুন্দরী দেবীকে বলেছিলেন—'দ্যাখ মা, তোর যত নাড়িভুঁড়ি নিয়ে পৃথিবীর লোকে এর পরে নাচবে। তোর ঐ ভাণ্ড থেকে এই ছেলে বেরিয়েছে।'

শুধু কেশবচন্দ্রই নন, পুণ্যবতী সারদাসুন্দরীর অপর দুই পুত্রও খ্যাতিমান ছিলেন। সমাজ কল্যাণে তাঁদের অবদানও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। জ্যেষ্ঠ নবীনচন্দ্র ছিলেন হিন্দু এ্যানুয়িটি ফাণ্ডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, আর কনিষ্ঠ কৃষ্ণবিহারী ছিলেন আলবার্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ। বৌদ্ধ সাহিত্যেও কৃষ্ণবিহারীর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। জীবন দর্শনে তিনি কেশবচন্দ্রের ছায়াস্বরূপ।

কোমল-হৃদয়া সারদাসুন্দরীর চিত্ত সমস্ত সদ্‌গুণে পরিপূর্ণ থাকলেও, তাঁর চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব ছিল না। একবার অসুস্থ কেশবচন্দ্রকে দেখতে গেলে ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞার অজুহাতে সারদাসুন্দরীকে বাধা দেওয়া হয়। অভিমানিনী

জননী দীপ্ত ভঙ্গিতে বলেন—আমার এই নিঃশ্বাসে কেশবের জন্ম, আমার রক্তে কেশবের দেহ, আমার নিঃশ্বাসে কখনও কেশবের অসুখ করিবে না। আমাকে তাঁর কাছে যেতে দাও।

কেশবচন্দ্রের ওপর যেমন অপরিসীম স্নেহ ছিল, জননীর প্রতিও কেশবচন্দ্রের ভক্তি ছিল তেমনি অফুরন্ত। জননীকে তিনি দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। জননীকে তিনি বলতেন—'তুমি আমার বড় ভাল মা, এ রকম মা কে পায়। আমার যা কিছু ভাল সব তোমার কাছ থেকে পেয়েছি। জননীর প্রতি তাঁর প্রকৃত ভাবটি তিনি নিজেই অন্যত্র প্রকাশ করেছেন—'মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্য, শান্তি, মা আমার শ্রী সৌন্দর্য, মা আমার ইহলোক পরলোক, মা আমার সম্পদ সুস্থতা। বিষম রোগ যন্ত্রণার মধ্যে মা আমার 'আনন্দ সুধা'।

সারদাসুন্দরী দেবী জীবনে পেয়েছেন অনেক, হারিয়েছেন আরো অনেক বেশি। সুদীর্ঘ জবিনে তিনি বহু মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। হারিয়েছেন পিতৃতুল্য শ্বসুর, দেবোপম স্বামী এবং প্রাণাধিক পুত্র কন্যাদের। কিন্তু বিনিময়ে লাভ করেছেন এক অলৌকিক অনুভূতি। তাঁর নিজের কথায় 'এই সমস্ত শোক দুঃখ, আনন্দোৎসবের খবর প্রায় রোজই আমার নিকট আসিতেছেন। ভগবান আমাকে একেবারে আনন্দে কিম্বা একেবারে দুঃখে থাকিতে দিতেছেন না। সুখে এবং দুঃখে তিনি আমায় পোড়াইতে পোড়াইতে সুখ-দুঃখের বাহিরে লইয়া যাইতেছেন। আমার এক অংশ যেমন রাজসিংহাসনে উত্তরাধিকারী, আর এক অংশ গৃহশূন্য, অর্থহীন প্রায় পথের ভিখারী, সুতরাং সুখ সংবাদেও আমি উতলা হই না এবং দুঃখের সংবাদও আমাকে কাতর করিতে পারে না। এই সমস্ত লীলাময় হরির খেলা মনে করি, এখন আমি এই প্রকাণ্ড পরিবারের মধ্যে বসিয়া, তাই। এক চোখে হাসি আর এক চোখে কাঁদি।

১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই ডিসেম্বর এই পুণ্যবতী মহিলার জীবনাবসান হয়।

সারদাসুন্দরী সম্পর্কে নিস্তারিনী দেবী তাঁর 'সেকেলে কথা'য় যথার্থ লিখেছেন—'ব্রহ্মানন্দ জননী যখন ভক্তিভরে প্রার্থনা করিতেন তাহা শুনিয়া পাষান হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যাইত। বাস্তবিক এরূপ উদার হৃদয় ভক্তিমতী ধার্মিকা জননী না হইলে কি ব্রহ্মানন্দের ন্যায় সাধু সন্তান গর্ভে ধারণ করিতে পারেন?'

গুরুদাস-জননী সোনামণি দেবী

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন দরিদ্র-ব্রাহ্মণ-সন্তান। কিন্তু অধ্যাবসায় এবং প্রতিভাবলে তিনি খ্যাতি ও প্রতিপত্তির উচ্চ শিকরে আরোহন করেন। জীবনের সমস্ত পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন এবং কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে সামাজিক গৌরবের সিংহাসন লাভ করেন। তাঁর এই ধারাবাহিক কৃতিত্ব লাভের মূলে ছিলেন একজন অসাধারণ রমণী, তিনি হলেন তাঁর জননী সোনামণি দেবী।

সোনামণি দেবী ছিলেন শোভাবাজার নবকৃষ্ণ ষ্ট্রিটের রামকানাই ন্যায় বাচস্পতির চতুর্থ কন্যা। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হিসাবে রামকানাই-এর সুনাম ছিল। অধ্যাপনা, যাগযজ্ঞ এসব নিয়েই তিনি থাকতেন। সোনামণি দেবী এই ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। পিতৃগৃহের এই পবিত্র প্রভাব সোনামণির উত্তর জীবনকেও মধুময় করে তোলে।

সোনামণি দেবীর দাম্পত্য জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী ছিল। গুরুদাসের জন্মের মাত্র তিন বছরের মধ্যেই তাঁর স্বামী রামচন্দ্র পরলোকগমন করেন। কিন্তু গুরুদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে এই অসামান্যা নারী কিভাবে জীবন কাটিয়েছিলেন, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। একজন আদর্শ নারীর মত তিনি যেমন তেজস্বিনী ছিলেন, তেমনি ছিলেন ধর্মানুরাগিনী। ভোগৈশ্বর্যের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট থাকতেন। জীবনের সমস্ত কাজকর্মে তিনি পরমেশ্বরে ওপর নির্ভর করতেন।

জননীর এই সমস্ত গুণ পুত্র গুরুদাসের জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি আশৈশব জননীর নির্দেশেই পরিচালিত হয়েছিলেন। সোনামণি দেবী তাঁর অসাধারণ দূরদর্শিতা গুণে পুত্র গুরুদাসকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করেন। সেকালে একজন প্রাচীনা ব্রাহ্মণ মহিল্যর পক্ষে এই দূরদর্শিতা তাঁর বিস্ময়কর চরিত্রেরই নিদর্শন।

রামচন্দ্র ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের কারটেগোর কোম্পানিতে একজন সাধারণ কর্মচারী হিসাবে কাজ করতেন। কিন্তু তাঁর ধর্মনিষ্ঠাকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও শ্রদ্ধা করতেন। অকাল মৃত্যুতে তিনি সংসারের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারেননি। অসহায় পত্নীর একমাত্র সম্বল ছিল তাঁর শিশুপুত্র গুরুদাস।

স্বামী বিয়োগে অকূল পাথারে পড়লে, তেজস্বিনী সোনামণি দেবী একাই সংগ্রাম করে সংসারটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। গুরুদাসের পিতামহী তখন বেঁচেছিলেন। সেই অবস্থার মধ্যেও সোনামণি দেবী পুত্রকে কোন সুশিক্ষা দিতে বাকি রাখেননি। যে ত্যাগ এবং বৈরাগ্য তাঁর নিজের ভূষণ ছিল, সেই ভূষণেই অলংকৃত করেছিলেন পুত্র গুরুদাসকে। জননীর সুশিক্ষায় গুরুদাস সৌজন্য ও শিষ্ঠাচারের প্রতিভূরূপেও খ্যাতি অর্জন করেন।

কঠোর শাসন ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে সন্তান পালন করলেও সোনামণি দেবীর অন্তর এবং অবলম্বন ছিল কিন্তু স্নেহ। তিনি শারীরিক নির্যাতন কিংবা কঠোর শাস্তিদানের বিরোধী ছিলেন। তাঁর এই অতুলনীয় কৃতিত্বে তিনি পতিগৃহ নারকেলডাঙ্গা অঞ্চলে একজন আদর্শ জননীরূপে সর্বজনপূজ্যা হয়ে উঠেন। প্রতিবেশীনিরা তাঁর কাছে এসে সন্তানকে কিভাবে সুশিক্ষা দিতে হয়, জেনে যেতেন। গুরুদাসের অকপট নির্মল চরিত্রের অন্তরালে সকলেই পুণ্যবতী জননীর ছায়া দেখতে পেতেন।

দেবীসদৃশ জননীকে গুরুদাস দেবীজ্ঞানেই ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। তিনি কখনও জননীর আদেশ অমান্য করেননি। জননী পুত্রকে বাড়ির বাইরে জলস্পর্শ করতে নিষেধ করেছিলেন, গুরুদাস আজীবন এই আদেশ কঠোরভাবে পালন করেছেন। জননী পুত্রকে শিখিয়েছিলেন, ত্যাগই ব্রাহ্মণের ভূষণ, গুরুদাস সেই শিক্ষা আজীবন মাথায় তুলে রেখেছিলেন। জননী গীতাপাঠ শুনতে ভালবাসতেন, গুরুদাসের জীবনেও গীতা অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। জননীর আদর্শে তাঁর আচরণেও কেউ কোনদিন আঘাত পাননি। জননী পরচর্চা-পরনিন্দাকে পরিহার করতে বলে, গুরুদাসও আজীবন ঐগুলি ঘৃণা করেছেন।

সোনামণি দেবী তাঁর পতিগৃহটিকে দেবালয় বলে মনে করতেন। শ্বশুরের

ভিটের প্রদীপ দেওয়া তাঁর নিত্যকর্ম ছিল। গুরুদাস যখন বাইরে আইন ব্যবসার জনে বহরমপুরবাসী হন, জননীও সেসময় তাঁর কাছে থাকতেন। কিন্তু সেখানে তাঁর মন টেকেনি। শ্বশুরালয়ের জন্যে তাঁর মন ছটফট করত। মাতৃভক্ত গুরুদাসও তাই কলকাতা ফিরে এসে হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন।

সোনামণি দেবীর আত্মমর্যাদাজ্ঞান ছিল প্রখর, কিন্তু অহঙ্কার ছিল না; জ্যেষ্ঠ পৌত্র হারানচন্দ্র একবার তাঁকে 'জীবন্ত গীতা' বলে অভিহিত করলে তিনি শঙ্কিত হয়ে বলে ওঠেন—অমন কথা মুখে আনতে নেই। জননীর ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তাধারা সাধারণ নীতিবোধের অনেক উর্দ্ধে প্রসারিত ছিল বলে গুরুদাসের জীবন এমন পুণ্যময় হয়ে ওঠে আদালতে আজীবন প্রয়োগ করে গুরুদাস বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর কর্তব্যপরায়ণতা ও নিষ্ঠা ছিল কিংবদন্তীর মত। সুদীর্ঘ ষোলবছর বিচারপতি থাকাকালীন তিনি অসুস্থতা ছাড়া কখনও আদলতে অনুপস্থিত হননি। পুত্র যতীনচন্দ্রের মৃত্যুদিনও তিনি হাজির হয়েছিলেন।

জননী সোনামণিদেবী পুত্র গুরুদাসের এই গৌরবময় জীবন দেখে গেছেন। তাঁর কৃতকর্মের ফল শুধু তিনি একা নন, সমগ্র জাতিই উপভোগ করে ধন্য হয়েছে। ১৩২০ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে অসামান্যা জননী দেহত্যাগ করেন। মাতৃভক্ত গুরুদাস জননীর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মে কোন ত্রুটি রাখেননি।

মাতৃভক্তির জন্যে বিদ্যাসাগর যেমন গুরুদাসকে শ্রদ্ধা করতেন, বিদ্যাসাগরকেও অনুরূপ শ্রদ্ধা করতেন গুরুদাস। গুরুদাসের আমন্ত্রণে বিদ্যাসাগর সোনামণি দেবীর শ্রদ্ধাবাসরে উপস্থিত থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন। মাতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গুরুদাস বিদ্যাসাগরকে একটি রূপোর গ্লাস দিয়েছিলেন। তাতে একটি শ্লোক খোদাই করা ছিল—

পানপাত্র মিদং দত্তং বিদ্যাসাগর শর্মণে।

স্বর্গকামনায় মাতুর্গুরুদাসেন শ্রদ্ধায়।।

বঙ্গদেশে মাতৃভক্ত দুই মহান সন্তানের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন সোনামণিদেবীর মাতৃত্বেরই যোগ্য প্রতিদান।

গিরিশ-জননী রাইমণি দেবী

কলকাতা সিমলা অঞ্চলে মদন মিত্র লেনের বসুপরিবার এককালে বেশ খ্যাতিসম্পন্ন ছিল। ধর্মনিষ্ঠা বৈষ্ণব এবং দাতা হিসাবে এই বংশের চুনীরাম বসু সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর পুত্র রাধাগোবিন্দের মধ্যমা কন্যা রাইমণিদেবীই হলেন মহাকবি গিরিশচন্দ্রের জননী। রাইমণির সহোদর নবীনকৃষ্ণও অসাধারণ পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। মাতৃ-বিয়োগের পর গিরিশচন্দ্রের জীবনে মাতুল নবীনকৃষ্ণের প্রভাবই ছিল সর্বাধিক।

রাইমণি দেবীর যখন নীলকমল ঘোষের সঙ্গে বিয়ে হয়, তখন তিনি বালিকা মাত্র। কিন্তু পতিগৃহে এসে তিনি আপন মহিমায় সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী হয় ওঠেন। রাইমণি ছিলে পরম ভক্তিমতী, শ্বশুরালয়ে এসে গৃহদেবতা শ্রীধর দেবের নিত্যসেবা না করে তিনি জলস্পর্শ করতেন না। দেবসেবায় তাঁর নিষ্ঠা এবং ভক্তি দেখে পরিবারের সকলেই খুশি হন। পিতামাতার অতি আদরের দুলালী শ্বশুরালয়ে এসেও আদরিনী হয়ে ওঠেন।

জননী সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র বলেছেন—'আমার মাতা কোমলপ্রাণা ছিলেন। শৈশবকাল হইতেই দেবদ্বিজে তাঁহার অতিশয় ভক্তি ছিল, ঠাকুর দেবতার কথা শুনিতে এবং দেবদেবীর স্তব পাঠ করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। বৈষ্ণব ভিখারী বাটিতে আসিলে পয়সা দিয়া গান শুনিতেন। আমি পিতার নিকট বিষয়বুদ্ধি ও মাতার নিকট কাব্যানুরাগ ও ভক্তি পাইয়াছি।' জননীর এই ভক্তি এবং কাব্যানুরাগ গিরিশচন্দ্রের মধ্যেও দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। উত্তরজীবনে তাঁর দিব্যানুভূতি লাভ হয়েছিল জননীর পুণ্যপ্রভাবে।

শৈশবে গিরিশচন্দ্র মায়ের সান্নিধ্য খুব বেশি লাভ করতে পারেননি। তিনি ছিলেন পিতামাতার অষ্টম সন্তান, তার ওপর তাঁর জন্মের পরেই রাইমণিদেবী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থা জননী তাই শিশু গিরিশচন্দ্রের ভার অর্পণ করেন উমা নামে এক বাগ্‌দিনীর ওপর। তারই স্তন্যদুগ্ধ পান করে গিরিশচন্দ্র লালিতপালিত হন্য রাইমণিদেবীর এই ভেদাভেদশূন্য মনোভাব গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী জীবনকে খুবই প্রভাবিত করে। পরপর পাঁচটি কন্যার পর গিরিশচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল বলে নীলকমল খুবই ঘটা করেছিলেন। বাজনা-বাদ্যি, দানধ্যান এমনকী, দীনদুঃখীদের শীতবস্ত্রও বিতরণ করা হয়েছিল।

কিন্তু এই উৎসবের জের বেশি দিন থাকেনি। গিরিশচন্দ্রের অগ্রজ নিত্যগোপালের আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা পরিবার ভেঙে পড়ে। পুত্রশোকে জননী রাইমণিদেবী উন্মাদিনীর মত দিন কাটান। গিরিশচন্দ্রের ওপরেও তাঁর আগ্রহ দিন দিন কমতে থাকে। তিনি তাঁকে একদম আদর করতেন না, কাছে গেলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতেন। কু-কথা বললে মুখে গোবর টিপে ধরতেন। নীলকমল পত্নীর এই আচরণের কোন সংগত কারণ খুঁজে পাননি। স্বভাবতই তাঁর আগ্রহ গিরিশচন্দ্রে দিকে ক্রমশ বাড়তে থাকে।

শেষ পর্যন্ত এই অস্বাভাবিক আচরণের কারণ জানা যায়। স্নেহাতুরা জননীর অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে তখন সকলেই মুগ্ধ হন। একবার গিরিশচন্দ্রের জ্বর হলে জননী ব্যাকুল ভাবে স্বামীকে ডেকে বলেন—যেমন করে হোক ওকে তুমি বাঁচাও। নীলকমল এই আকুলতায় বিস্মিত হয়ে বলেন—তুমি গিরিশের জন্যে এত ব্যাকুল হয়ে উঠছ কেন? ওর জন্যে তোমাকে কখনও এত উদ্বিগ্ন হতে দেখিনি!

এই কথায় জননীর রুদ্ধ অভিমান যেন ফেটে পড়ে। কাঁদতে কাঁদতে তিনি জবাব দেন—আমি রাক্ষসী, এক সন্তানকে খেয়েছি। এটি অষ্টম গর্ভের ছেলে, পাছে আমার দৃষ্টিতে কোন অমঙ্গল হয়, তাই ওকে কাছে আসতে দিই না। কখনও মিষ্টি কথা বলিনি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

জননীর এই অন্তঃসলীলা স্নেহ-ফল্গুধারার স্পর্শ যেন বালক গিরিশচন্দ্রে অন্তরেও গভীর দাগ কাটে। এই উপলব্ধির কথা তিনি কখনও ভোলেননি।

পরবর্তীকালে 'অশোক' নাটকে জননী সুভদ্রাঙ্গীর উক্তিতে আপন জননীর বেদনাকে মূর্ত করেছেন—

স্নেহ-দৃষ্টে চাহিলে তোমার পানে
পাছে তব হয় অকল্যাণ
স্নেহের প্রকাশ নাহি কর সেই হেতু।

জ্যেষ্ঠ পুত্র নিত্যগোপালের শোকে রাইমণি দেবী ভেঙে পড়েন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি মৃতকন্যা প্রসর করে এই মহীয়সী জননী পরলোক গমন করেন। জননীর মৃত্যু সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন—'বাড়ী ঢুকিয়া দেখি, সকলেরই কেমন বিমর্ষ ও ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। ক্ষণকাল পরেই ভিতর-বাটী হইতে শাঁখ বাজিয়া উঠিল, শুনিলাম আমার একটি ভগ্নী হইয়াছে, কিন্তু সে শঙ্খরোল থামিতে না থামিতে সহসা বাটীতে ক্রন্দন রোল উঠিল। জননী মৃতকন্যা প্রসব করিয়া স্বর্গারোহন করিলেন।'

শৈশবে পিতামাতাকে হারিয়ে গিরিশচন্দ্রের জীবনে নেমে আসে দুর্যোগের কালো মেঘ। কিন্তু স্নেহময়ী জননীকে তিনি কোনদিন ভুলতে পারেননি। তাঁর সৃষ্টিতে কয়েকটি জননী-চরিত্র অঙ্কন করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। অগ্রজের মৃত্যুতে তিনি শৈশবে শোকাতুরা জননীকে দেখেছিলেন, তারই ছটা বিচ্ছুরিত হল দুটি পুত্র শোকাতুরা জননী-চরিত্রে-জনা নাটকে 'জনা', আর বুদ্ধদেব চরিতে 'ক্ষেত্রমণি'। তাছাড়া মাতৃস্তুতিও করেছেন বহুস্থানে—

মা বলে ডাকিলে
দিগম্বরে যাই সখি ভুলে।

তাঁর দক্ষযজ্ঞ নাটকে বর প্রার্থনা করতে গিয়ে সতী বলেছে—

বর তব দেহ, ভোলানাথ
ত্রিশূল আঘাত তারে কভু না করিবে
মা বলে যে ডাকিবে আমারে।

তাঁর সৃষ্টি সমস্ত জননী-চরিত্রই মাতৃত্বের স্নিগ্ধতায় সঞ্জীবিত। গিরিশচন্দ্রের উত্তরজীবনে আধ্যাত্মিক পরিবর্তনও শুরু হয়েছিল পরলোকগতা জননীর প্রভাবে। দ্বিতীয়বার স্ত্রীবিয়োগের পর গিরিশচন্দ্র তখন মানসিক ভারসাম্যহীন।

শারীরিকভাবে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। সেই অবস্থাতে তিনি কলেরার রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকরাও তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। অসহায় কবির তখন বিল্বমঙ্গল নাটকের পাগলিনীর মত উচ্চারণ করা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না—

মা বলে ডাকছি কত
বাজে না মা তোর প্রাণে?

সে আচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি দেখেন যে, তাঁর স্বর্গতা জননী এসে তাঁকে কি একটু খাইয়ে দিয়ে বলছেন—এই মহাপ্রসাদ খাও, ভাল হয়ে যাবে, কোন ভয় নেই!

চেতনা ফিরে আসার পরেও গিরিশচন্দ্র মাতৃদত্ত প্রসাদের আস্বাদ অনুভব করেন। এই অলৌকিক ঘটনার পর থেকেই তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হন। মহাকবি গিরিশচন্দ্র রূপান্তরিত হন ভক্তভৈরব গিরিচন্দ্রে!

শিবনাথ-জননী গোলোকমণি দেবী

জননী গোলোকমণি দেবী সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিত' এ লিখেছেন—'তিনি নিজে তেজস্বিনী ও মনস্বিনী নারী ছিলেন। তাঁহাতে দারিদ্র্য ছিল, কিন্তু ক্ষুদ্রতা ছিল না; কোমলতা ছিল, কিন্তু ভীরুতা ছিল না; সাধুভক্তি পূর্ণমাত্রায় ছিল, কিন্তু অন্ধতা ছিল না; স্বধর্মানুরাগ প্রবল ছিল, কিন্তু পরধর্মে বিদ্বেষ ছিল না।'

শিবনাথ-জননী গোলোকমণি দেবী সম্পর্কে এই উপলব্ধিটুকু খুবই মূল্যবান। প্রকৃতপক্ষে এই পরস্পর বিরোধী দুর্লভগুণেই সমৃদ্ধ ছিল তাঁর চরিত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর দুটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। তাঁর পিতা চাঙড়িপোতা গ্রাম নিবাসা অধ্যাপক ন্যায়রত্ন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের ছাত্র। কলকাতা কাঁসারিপাড়া অঞ্চলে তাঁর চতুষ্পাঠীটি সেকালে একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এছাড়া তাঁর অতিরিক্ত ছাত্রও থাকত। স্বনামধন্য রামতনু লাহিড়ী ও কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর ছাত্র ছিলেন। সাহিত্য-রচনাতেও হরচন্দ্রের দক্ষতা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে তাঁর সুবিখ্যাত 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকা সম্পাদনায় তিনি সহায়তা করতেন। হরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। 'সোমপ্রকাশ' পত্রের সম্পাদক হিসাবে তিনি অবিস্মরণীয়। তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করতেন এবং বিদ্যাসাগরের সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁর সাধু-চরিত্র সম্পর্কে শিবনাথ লিখেছেন—'পাপের

প্রতি তাঁর এমন ঘৃণা ছিল যে, গ্রামের পাপাচারী লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া কাঁপিত।' এই দুই চরিত্রের সংস্পর্শেই গোলোকমণি দেবীর শৈশব অতিবাহিত হয়।

গোলোকমণি দেবীর পিতৃকুলের মত শ্বশুরকুলও সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিল। মজিলপুর গ্রাম নিবাসী হরানন্দ ভট্টাচার্যের সঙ্গে যখন তাঁর বিয়ে হয়, তখন তিনি বালিকা আর হরানন্দের বয়স দশ বছর। বিয়ের সময় শুধু তাঁর শ্বশুর নন, দাদাশ্বশুর বৃদ্ধ রামজয় ন্যায়ালঙ্কারও জীবিত ছিলেন। তাঁর মত ধার্মিক পুরুষ সে যুগে বড় একটা দেখা যেত না। শিক্ষাদীক্ষা এবং সামাজিক প্রতিপত্তির সুবর্ণদিনেই গোলোকমণিদেবী এই পরিবারের বধূ হয়ে আছেন।

পিতৃগহে লেখাপড়া বেশি না-হলেও, গোলোকমণির সুশিক্ষার অভাব হয়নি। স্বামী হরানন্দ বিদ্যানুরাগী ছিলেন। বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারে সাহচর্যে এসে তিনি স্ত্রী শিক্ষাতেও অগ্রণী হন। পত্নী গোলোকমণিকেও তিনি পড়াতে শুরু করেন। সংসারের সমস্ত কাজ সেরে গোলোকমণি স্বামীর কাছে রাত দশটায় পড়তে বসতেন। এজন্যে ননদিনীর কাছে তাঁকে কম ভর্ৎসনা সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু তিনি লক্ষভ্রষ্ট হননি। তিনি রামায়ণ-মহাভারত পড়তে ভালবাসতেন এবং প্রতিদিন কিছুটা সময় ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন।

আস্তে আস্তে আপন মহিমায় গোলোকমণিদেবী সংসারে স্নেহ আদায় করে নেন। বালিকা-বধূ হয়ে ওঠেন সুগৃহিনী। স্বামী হরানন্দ অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, ক্রুদ্দ হলে তাঁর হিতাহিত জ্ঞান থাকত না। বুদ্ধিমতী গোলোকমণি স্বামীর ন্যায়-নিষ্ঠতার দিকটিই আঁকড়ে থাকতেন।

গোলোকমণি দেবীর অসাধারণ বিচক্ষণতা ছিল। স্বামীর মাত্র তিরিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা আয়ের মধ্যেই তিনি সব কিছু পরিচালনা করতেন। শুধু সংসার চালানোই নয়, দানধ্যানও হত ঐ থেকে। তাঁর মঙ্গলময় হস্তের কল্যাণে আজীবন তিনি স্বামীর কোন ঋণ রাখেননি। প্রতিদিন কাউকে কিছু দান না করেও তিনি অন্নজল গ্রহণ করতেন না। পুত্রকেও তিনি এই মহান ব্রতে দীক্ষা দিয়েছিলেন অতিথি না এলে শিবনাথকে তুলসীগাছে এক ঘটি জল ঢেলে

খেতে বসতে হত। জননীর এই শিক্ষাকে শিবনাথ তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলে স্বীকার করেছেন।

ছলচাতুরী বা কপটতাকে গোলোকমণি দেবী ঘৃণা করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর দেবোপম চরিত্রগঠনে সর্বাধিক প্রভাব ছিল জননী গোলোকমণিদেবীর, তারপর মাতুল দ্বারকানাথের। জননীর হাতেই তাঁর শিক্ষারম্ভ হয়। তাঁরই যত্নে তিনি দিন দিন লেখাপড়ায় উন্নতি করেন। কিছু দিন পরে গোলোকমণি দেবী পুত্রকে গ্রামের পাঠশালা ছাড়িয়ে হার্ডিঞ্জ মডেল স্কুলে ভর্তি করান। কলকাতায় পড়তে যাবার আগে পর্যন্ত জননী গোলোকমণিই ছিলেন তাঁর প্রেরণাদাত্রী।

গোলোকমণি দেবী ধর্মানুরাগী ছিলেন। কিন্তু তাঁর ধর্মবোধ সঙ্গীর্ণ ছিল না। আর্তের সেবাযত্নকেই তিনি সবচেয়ে বড় ধর্ম বলে মনে করতেন। একবার দুর্ভিক্ষের সময় একজন দুঃখী মানুষ আসে তাঁর কাছে। জিজ্ঞেস করে তিনি জানতে পারেন যে, লোকটি বহুদিন কিছুই খায়নি। দয়াবতী গোলোকমণি জাতিধর্ম ভুলে গিয়ে সেদিন তাকে নিজের হাতে খাওয়ান। সেকালে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের একজন গৃহবধূর পক্ষে কাজটি নিতান্ত সহজ ছিল না।

ধর্মের ব্যাপারেও তাঁর গোড়ামি ছিল না। উত্তরকালে পুত্রের প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মধর্মে যোগদান করতেও তিনি বিরূপ হননি। গোলোকমণিদেবীর চরিত্র ছিল 'বজ্রদপি কঠোরানি, মৃদুনি কুসুমাদপি।' স্নেহময়ী জননী সন্তানকে যেমন স্নেহসুধায় অভিসঞ্চিত করেছেন, সুশিক্ষাদানে কঠোর হতেও তেমনি দ্বিধা করেননি।

শিবনাথকে তিনি প্রাণাধিক ভালবাসতেন। শিবনাথ একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে তিনি উন্মাদিনীর মত দিন যাপন করেছিলেন। রোগমুক্তির জন্যে ঠাকুরের কাছে মানত করে তিনি মাথায় ও হাতে ধুনো পোড়ান এবং বুক চিরে রক্ত দেন। শিবনাথের দাম্পত্যজীবন ও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের সময়ে জননীই ছিলেন পুত্রের একমাত্র সহায়। প্রখর আত্মমর্যাদাজ্ঞান সম্পন্ন মহাতেজা পিতৃদেবের সঙ্গে পুত্রের মতামত বিনিময়ের একমাত্র মাধ্যম ছিলেন জননী গোলোকমণি। পরিণত বয়সে এই পুণ্যবতী জননী স্বামীপুত্র রেখে স্বর্গারোহন করেন।

জননী সম্পর্কে শিবনাথ তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন—মা ভালোবাসিবার সময় ফুলের ন্যায় কোমল, অথচ শাসন করিবার সময় লৌহের ন্যায় কঠিন হইতেন। অতএব ইহা আমি অকুণ্ঠিতভাবে বলিতে পারি যে, আমি যে ঈশ্বরে ও পরকালে এবং সত্যে ও নিজ কর্তব্যে আস্থা রাখিতে শিখিয়াছি তাহা অনেক পরিমাণে আমার জননীকে দেখিয়া। তিনি যে কেবল তাঁহার স্তন্যদুগ্ধের দ্বারা আমাকে লালন পালন করিয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার চরিত্র দ্বারাও আমার চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন।

জননীর জীবনে এর চেয়ে বড় সিদ্ধিলাভ আর কি হতে পারে? তাঁর কাব্যে জননীর প্রতি আহ্বান যেন শাশ্বত আকুলতা হয়ে আজও প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে—

তুমি মা আমার স্নেহ কল্লোলিনি,
সন্তানের প্রাণে এস একবার

শিবনাথের মাতৃভক্তি ছিল উল্লেখ করার মত শিবনাথ-কন্যা হেমলতা দেবী লিখেছেন—'বাল্যকাল হইতে জননীকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছেন, ভক্তি করিয়াছেন, একদিনের জন্যও তাঁর মাতৃভক্তির ভাঁটা পড়ে নাই।'

জগদীশ-জননী বামাসুন্দরী দেবী

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিজ্ঞান-চর্চার শীর্ণকায় ধারাটি যাঁদের হাতে পরিপুষ্ট হয়ে স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করে, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু হলেন তাঁদের পুরোধা। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিক্রমপুরের কাছে রাঢ়িখাল গ্রামে জগদীশচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু, মাতা বামাসুন্দরী দেবী।

ভগবানচন্দ্রের শুধু সামাজিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তিই ছিল না, তিনি ছিলেন একজন আদর্শ পুরুষ। বজ্রের মত কঠোর আর কুসুমের মত কোমল ছিল তাঁর অন্তঃকরণ। তাঁর হৃদয় ছিল উদার-উন্মুক্ত, জাতিধর্মের কোন রকম বৈষম্য তিনি মানতেন না। পুত্র জগদীশচন্দ্রের অন্তরেও যাতে এই মনোভাবটি গড়ে ওঠে, সেদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। শৈশবে বিদ্যালয়ে পুত্রের বসার আসন নির্দিষ্ট হয় দুজন সহপাঠীর মাঝখানে—যাদের মধ্যে একজন ছিল মুসলমান, আর একজন ছিল জেলে। এই ভাবে জগদীশচন্দ্রের হৃদয়ও এমনি উদার উন্মুক্ত হয়ে গড়ে ওঠে।

বাবা যেমন ছিলেন উদার প্রকৃতির, মা বামাসুন্দরী দেবী তেমনি ছিলেন স্নেহশীলা। তিনি জাতি বিচার মানতেন না। ছোটবড় ভেদাভেদ জ্ঞানও তাঁর ছিল না। কর্তব্যপরায়ণতা ছিল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। জগদীশচন্দ্র যে অধ্যয়নকে আজীবন তপস্যার মত মনে করতেন, সে-শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন জননীর

কাছ থেকে। জননীর স্নেহচ্ছায়াতেই জগদীশচন্দ্রের মানসিক কাঠামোটি নির্মিত হয়। পরবর্তী কালে জগদীশচন্দ্রের মানসিক কাঠামোটি নির্মিত হয়। পরবর্তী কালে জগদীশচন্দ্র নিজেও সেকথা স্বীকার করেছেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেছেন—'আমার মায়ের স্নেহতেই আমি এত বড় হতে পেরেছি।'

বামাসুন্দরী দেবী ছিলেন পাঁচ কন্যা এবং দুই পুত্রের জননী। স্বামী পুত্র-কন্যা পরিবেষ্টিত তাঁর সংসার ছিল চাঁদের হাটের মত। তাঁর পাঁচকন্যা স্বর্ণপ্রভা, লাবণ্যপ্রভা, হেমপ্রভা ও চারুপ্রভা শুধু নামেতেই নয়, রূপেগুণেও অনন্যা ছিলেন। আর সবার ওপরে ছিলেন জ্যেষ্ঠপুত্র জগদীশচন্দ্র, রূপে গুণে তাঁর তুলনা মেলে না। চাকুরীজীবি ভগবানচন্দ্রের বড় সংসারে যে সাময়িক অনটন ছিল না, তা নয়, কিন্তু বামাসুন্দরী সেসব ভ্রূক্ষেপই করতেন না। ভগবানচন্দ্রের আনন্দমেলায় তিনিই ছিলেন প্রকৃত আনন্দময়ী!

সন্তানদের ওপর বামাসুন্দরী দেবীর স্নেহ ছিল অফুরন্ত। তিনি যেন সজাগ সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে পাহারা দিয়ে থাকতেন তাঁদের। আগলে থাকতেন তাঁদের স্বার্থ। তাই তাঁর কনিষ্ঠপুত্র যখন মাত্র দশ বছর বয়সে মারা যায়, তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েন। জগদীশচন্দ্র তখন ছাত্র, সবে কলেজে ভর্তি হয়েছেন।

পুত্র বিয়োগের পর শোকাতুরা জননীর সময় স্নেহ গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয় জগদীশচন্দ্রের ওপর। তিনি জননীর নয়নের মণি হয়ে ওঠেন। স্নেহান্ধ জননী জগদীশচন্দ্রকে চোখের আড়াল হতে দিতেন না। ভগবানচন্দ্র যখন জগদীশচন্দ্রকে উচ্চশিক্ষার জন্যে ইংলন্ড পাঠাবার মনস্থ করেন, তখন বামাসুন্দরী কিছুতেই মত দেননি। মাতৃভক্ত পুত্রকেও তাই অন্য পথের কথা ভাবতে হয়। কিন্তু ভগবানচন্দ্র শেষ পর্যন্ত পত্নীকে সব বুঝিয়ে বলেন। স্নেহময়ী জননী তখন সম্মতি দেন। শুধু সম্মতি কেন, পুত্রের পড়াশোনার ব্যয়ভার হিসেবে তুলে দেন অলঙ্কারগুলি। সন্তানের উন্নতিই তো তাঁর একমাত্র কাম্য বস্তু। আর সন্তানই তো হল সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার!

বামাসুন্দরীর সৌভাগ্যের সীমা পরিসীমা ছিল না। জীবনে তিনি পেয়েছিলেন

দেবতুল্য আদর্শ স্বামী, গুণবান পুত্র এবং সর্বোপরি পেয়েছিলেন, কৃতী জামাইদের। প্রথম ভারতীয় বাংলার মনীষী আনন্দমোহন বসু ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা। আনন্দমোহনের অনুজ মোহিনীমোহনের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর দ্বিতীয়া কন্যার। মোহিনীমোহন ছিলেন একজন খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথ। তৃতীয় কন্যা লাবণ্যপ্রভার স্বামী ডাঃ হেমচন্দ্র সরকারও ছিলেন একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক। পুত্র জগদীশচন্দ্রের প্রতিভারও পরিপূর্ণ প্রকাশ তিনি দেখেছিলেন। পুত্রের বিশ্বজোড়া খ্যাতি দেখে তিনি যে স্বর্গসুখ উপভোগ করেছিলেন, সন্দেহ নেই।

স্নেহশীলা হলেও, বামাসুন্দরী দেবীর চরিত্রে কিন্তু দৃঢ়তার অভাব ছিল না। মর্যাদা রক্ষার জন্যে তিনি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারতেন। পুত্র জগদীশচন্দ্রের চরিত্রেও এই গুণটি প্রতিফলিত হয়। বিলাত প্রত্যাগত জগদীশচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক, তখন শুধুমাত্র ভারতীয় এই অপরাধে তাঁকে সম্পূর্ণ বেতন দেওয়া হয়নি। জগদীশচন্দ্র সেদিন মর্যাদা রক্ষার জন্যে আংশিক বেতন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু অধ্যাপনার কাজ তিনি ছাড়েননি, নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করেছেন। সেদিন তাঁকে এই অদম্য মনোবল জুগিয়েছিলেন জননী বামাসুন্দরী দেবী। অথচ ভগবানচন্দ্র তখন রোগে ম্রিয়মান, সংসারের অর্থনৈতিক অবস্থাও তখন রীতিমত সংকটজনক।

এক মাস দুমাস নয়, সুদীর্ঘ তিন বছর এই কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু বামাসুন্দরী দেবী নিজে ভেঙে পড়েননি, ভেঙে পড়তে দেননি পুত্রকে। জননীকে দেবীর মত শ্রদ্ধা করতেন জগদীশচন্দ্র। জননীর কথা তাঁর কাছে ছিল বেদবাক্যের মত। সেই শক্তিতেই তিনি বলীয়ান হয়ে ওঠেন।

বামাসুন্দরী ছিলেন সহজ-প্রাণা মহিলা। বিলাস-ব্যসন কাকে বলে তিনি জানতেন না। সংসারে কর্তব্যবোধের বেদীতে তিনি হাসিমুখে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র যেদিন তিন বছরে পুরো বেতনের টাকা তুলে দেন জননীর হাতে, সেদিন সাশ্রুনয়নে জননী বলেছিলেন—তোমার

টাকা আর আমার শেষ অলঙ্কারগুলি দিয়ে তোমার বাবার সমস্ত ঋণ পরিশোধ কর। রোগশয্যার মৃত্যুপথযাত্রী ভগবানচন্দ্র সেদিন শুধু পত্নীর দিকে তাকিয়ে অশ্রুমোচন করেছিলেন।

ঋণমুক্ত হবার কিছুদিনের মধ্যেই ভগবানচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন। পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী বামাসুন্দরীও তাঁকে অনুসরণ করেন মাত্র দু'বছরের মাথায়। সংসারের সব দায়িত্ব তখন তাঁর শেষ। তিনি ভরমুক্ত। পুত্রের বিকীর্ণ আলোকেও তখন দিক-বিদিক আলোকিত।

প্রফুল্লচন্দ্র-জননী ভুবনমোহিনী দেবী

যে-পুণ্য স্রোতা কপোতক্ষ নদকে মধুসূদন তাঁর কাব্যে অমর করে রেখেছেন, সেই কপোতক্ষ নদের তীরেই জন্ম তিন জন বাঙালী মনীষীর। রাঢ়ুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সাগরদাঁড়ি গ্রামে কবি মধুসূদন এবং পলুয়া-মাগুরা গ্রামে জন্ম হয় শিশির কুমার ঘোষের। এই গ্রামটিই পরে শিশির কুমারের জননী অমৃতময় দেবীর নামে অমৃত বাজার নামে পরিচিত হয়।

রাঢ়ুলি গ্রামে জমিদার ছিলেন প্রতাপশালী হরিশচন্দ্র রায়চৌধুরী। তিনি শুধু বিচক্ষণ জমিদারই ছিলেন না, বিদ্যানুরাগ, পরোপকার এবং হৃদয়বান মানুষও ছিলেন। তাঁর মন ছিল সংস্কার মুক্ত, প্রগতিবাদকে তিনি কখনও নীতির দোহাই দিয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করেননি। তিনি জাতিভেদ মানতেন না এবং স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহ সমর্থন করতেন।

এই হরিশচন্দ্রের সঙ্গেই ভাড়া-সিমলা নিবাসী নবকৃষ্ণ বসুর রূপবতী ও গুণবতী কন্যা ভুবনমোহিনীর শুভ পরিণয় হয়। ভুবনমোহিনীর সহোদর হরিশচন্দ্র বসুও সেকালের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন।

হরিশচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা খুবই স্বচ্ছল ছিল, প্রায় চার মাইল ব্যাসার্ধ জুড়ে বিস্তৃত ছিল তাঁর জমিদারি। বসতবাড়িটি ছিল প্রাসাদোপম। এই বাড়িতেই বধূ হয়ে আসেন ভুবনমোহিনী। বিদ্যানুরাগী হরিশচন্দ্র বিয়ের পর পত্নীকে সুশিক্ষিত করে তোলার প্রয়াসে বাড়িতেই একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তখন বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই বিদ্যালয়ে তিনি সর্বপ্রথম ভর্তি করেন পত্নী ও সহোদরাকে। মাঝে মাঝে তিনি যখন কলকাতায় বসবাস করতেন, তখন সেখানেও ভুবনমোহিনীর বিদ্যাচর্চা হত। কলকাতায় তাঁকে

বাংলা পাঠে সাহায্য করতেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর। হরিশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টি পরবর্তীকালে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় এবং জননীর নামে প্রফুল্লচন্দ্র বিদ্যালয়ের নতুন নামকরণ করেন রাড়ুলি ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়।

ভুবনমোহিনী দেবী ছিলেন পরোপকারী এবং তাঁর কৃতিটি ছিল অত্যন্ত সরল। উদার হস্তে তিনি দানধ্যান করতেন। তাঁর আজীবন ব্রহ্মচারী পুত্র দানবীর প্রফুল্লচন্দ্র যে পরবর্তীকালে 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' মন্ত্রকে জীবনের ব্রত করেছিলেন, তার দীক্ষা লাভ হয় জননীর হাতেই। স্বামীর ন্যায় ভুবনমোহিনীও জাতিভেদ মানতেন না। পুত্র প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনও এই শুদ্ধাচারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। জননীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতাকেও তিনি মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। জননীর ওপর প্রফুল্লচন্দ্রের ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। শৈশবে রোজ তিনি জননীকে রামায়ণ-মহাবক্ত পাঠ করে শোনাতেন। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর একবার একাদশীর দিনে ডাব পাড়ার কোন লোক না পেয়ে প্রফুল্লচন্দ্র নিজেই ডাব পেড়ে জননীকে খাওয়ান।

ভুবনমোহিনী দেবীর দাম্পত্য সুখ-স্বাচ্ছন্দেরও অভাব ছিল না। তাঁর পাঁচ পুত্র হলেন—জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র, নলিনীকান্ত, প্রফুল্লচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র এবং এক কন্যা ইন্দুমতী। কনিষ্ঠপুত্র গোপালচন্দ্র কেবল অকালে মারা যান, অন্যান্য সকলেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রফুল্লচন্দ্রের জগৎ জোড়া খ্যাতিও জননী দেখে গেছেন।

মাত্র তের বছর বয়সে প্রফুল্লচন্দ্র ভয়ঙ্কর রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন এবং পড়াশোনা ছেড়ে বাড়িতে থাকতে বাধ্য হন। দু'বছর জননীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে তিনি রোগমুক্ত হন। সেই থেকে জননীর একটু বেশি স্নেহ বর্ষিত হত তাঁর আদরের 'ফুলু'র ওপর।

স্নেহপরায়ণা হলেও, ভুবনমোহিনী কিন্তু সংস্কারগ্রস্ত ছিলেন না। বিশ্ববিজয়ী পুত্র যখন বিলাত যাত্রার প্রস্তাব করেন, তখনও তিনি কোন সংস্কারের দোহাই দেননি। উদার স্বামীর সংস্পর্শে এসে তিনি নিজের জীবনও আলোকিত করতে পেরেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—'আমার বিলেত যাওয়া নিয়ে মা কোন আপত্তি করেননি। বাবার কাছ থেকে তিনি সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল

হবার শিক্ষা নিয়েছিলেন। সেকালে যে ধারণা ছিল, কালাপানি পার হলে জাত যায়—তা তিনি বিশ্বাস করতেন না।'

অশ্রুসজল মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় প্রফুল্লচন্দ্র জননীকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ভদ্রাসন মেরামত করবেন এবং সম্পত্তি রক্ষা করবেন। পরবর্তীকালে প্রফুল্লচন্দ্র অবশ্য প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু ভুবনমোহিনী তখন পরলোকে। দেশের বাড়িতে জননীর নামে তিনি একটি মন্দিরও নির্মাণ করিয়েছিলেন।

১৯০৪ সালে এই মহীয়সী জননী পরলোকগমন করেন। তাঁর বিশ্বজয়ী পুত্র তখন বিলাত-প্রবাসে। অগ্রজের কাছ থেকে এই নিদারুণ দুঃসংবাদ পেয়ে তিনি তাঁর ডাইরিতে লেখেন—'ভোর সকালে দাদার চিঠিতে জানতে পারলাম, মা আর নেই, কোন মানসিক আঘাত যে এত তীব্র এত ভয়ানক হতে পারে তা আমি জানতাম না। মাকে কেন্দ্র করেই তো আমার সব ভালবাসা। এই শূন্যতা পূরণ হবার নয়।

জননীর এই পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করে আজীবন তিনি ছুটি কাটাতে যেতেন জন্মভূমি রাঢ়ুলি গ্রামে। সেখানে বর্ষীয়সী মাসীমা-পিসীমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সমগ্র নারীজাতির ওপর তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করতেন। ভুবনমোহিনীদেবীর ভুবনমোহিনী চরিত্রের প্রভাবে সমগ্র নারীজাতিই তাঁর পুত্রের কাছে জননীরূপে সমাদর লাভ করে।
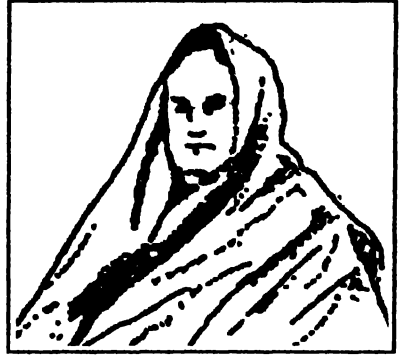
রবীন্দ্র-জননী সারদা দেবী

রবীন্দ্র-জননী সারদাদেবী যখন ঠাকুরবাড়িতে বধূ হয়ে আসেন, তখন তিনি বালিকা-মাত্র। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিরাট ঐশ্বর্য তখনও দূরে অপেক্ষমান। যশোহরে নিষ্ঠাবান রায়চৌধুরী পরিবারের এই বালিকার পায়ে-পায়েই বঙ্গদেশের বিশাল গৌরবময় ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় এসে প্রবেশ করল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। সরস্বতীর অপর নাম সারদা, বাণীর বরপুত্র, তাঁর সন্তানেরা জননীর এই পুণ্যনামের সার্থকতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

শৈশবে সারদাদেবী পিতৃস্নেহ পাননি, জননীর স্নেহেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তাঁর এক কাকা কলকাতায় শুনেছিলেন যে দেবেন্দ্রনাথের জন্য সুন্দরী মেয়ে খোঁজা হচ্ছে, তিনি তখন দেশ থেকে সারদাদেবীকে কলকাতায় নিয়ে এসে বিয়ে দেন। পাত্রী সারদাদেবীর বয়স তখন ছ'বছর আর পাত্র দেবেন্দ্রনাথের বয়স সতেরো। একজন বালিকা অপরজন কিশোর, কিন্তু রূপেগুণে এক আশ্চর্য যোগাযোগ। প্রিন্স দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ শুধু রূপবান নন, ঐশ্বর্যবান। রূপবতী বালিকা-বধূ শুধু এই সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্য দেখেছেন মুগ্ধ বিস্ময়ে।

ধীরে ধীরে দুটি কুঁড়ি বিকশিত হল। রূপবতী বালিকা হলেন যুবতী, আর দেবেন্দ্রনাথ হলেন পরিপূর্ণ যুবক। শিষ্য অজিতকুমারের ভাষায়—'আশ্চর্য রূপবান পুরুষ—দীর্ঘাকৃতি সুগঠিত শরীর, প্রশস্থ ও উজ্জ্বল ললাট; বড়ো বড়ো চোখ—তাহাতে যেন বিদ্যুতের মতো দীপ্তি, তেমনি মেঘের মতো স্নিগ্ধতা; বর্ণ অপূর্ব গৌর। শুধু রূপ নয়, বাবুয়ানিতেও কম যান না। বিলাসের আমোদ-আহ্লাদে ভেসে চললেন নব-দম্পতি।

কিন্তু একটি ছোট্ট ঘটনা নবদম্পতির জীবন স্রোতকে পরিবর্তিত করে দিল। পিতামহীর মৃত্যুতে কাছ থেকে মৃত্যুকে দেখলেন যুবক দেবেন্দ্রনাথ। কি এক বিদ্যানুভূতি যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। পত্নীর রূপলাবণ্য যখন টলমল করছে, তখন দেবেন্দ্রনাথ হলেন গৃহী সন্ন্যাসী। প্রকৃত অর্থেই সন্ন্যাসী, শুধু চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস' পছন্দ করেন না বলে এই গৃহবাস। অবলম্বন করলেন ব্রাহ্মসমাজ আর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। উদাসীনতার অলৌকিক আনন্দে নিমগ্ন হলেন তিনি।

স্বামীর সংসার-বৈরাগ্যে সারদাদেবী ব্যথিত হলেন বটে, কিন্তু বিচলিত হলেন না। তিনি দেবারাধরায় মনোনিবেশ করলেন। বারো মাসে তেরো পার্বন, যাগযজ্ঞ, ব্রাহ্মণকে গোদান—এসব নিয়েই ভুলে থাকার চেষ্টা করতে লাগলেন।

দেবেন্দ্রনাথের পরিধি বাড়ল। গৃহকোণ থেকে দেশান্তরের পাহাড় চূড়ায় যেতে শুরু করলেন। সারদাদেবী অপরিসীম উদ্বেগের মধ্যে স্বামীর অনুপস্থিতির দিনগুলি কাটাতে লাগলেন। জায়েরা সাধ্যসাধনা করলেও উৎসব, যাত্রাগান বা আমোদ আহ্লাদে যোগ দিতেন না। নির্জনে বসে স্বামীর মঙ্গল কামনায় শুধু ঈশ্বর সাধনায় দিন কাটাতে লাগলেন। এই দুর্বলতার সন্ধান পেয়ে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা স্বামীর কাল্পনিক বিবদ দূর করার অভিপ্রায়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের নাম করে ক্রমাগত অর্থ নিতে লাগল। সংসারেও মন দিতে পারতেন না তিনি।

পুত্রবধূ জ্ঞানদানন্দিনী লিখেছেন—মা তাঁর জন্য শুয়ে শুয়ে কেবল ভাবতেন তাই সংসারের কাজে বড় একটা মন দিতে পারতেন না। উদ্বিগ্ন জননীর আগ্রহেই রবীন্দ্রনাথ যে পিতাকে প্রথম চিঠি লিখেছিলেন—সেকথা আছে তাঁর স্মৃতিকথায়।

পতিব্রতা সারদাদেবীও একদিন স্বামীর সঙ্গে হিমালয় যেতে চাইলেন। কিন্তু শান্ত সমাহিত দেবেন্দ্রনাথ পত্নীকে বুঝিয়ে বললেন পথের ক্লেশ এবং বিপদ আপদের কথা। কিন্তু ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ ভরা ভাদ্র মাসের একদিন এই রমণীরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙল। দেবেন্দ্রনাথ সেদিন সহকর্মী রাজনারায়ণকে নিয়ে নৌকা ভ্রমণে রওনা হবেন, এমন সময় সারদাদেবী এসে দাঁড়ালেন গঙ্গাতীরে। সঙ্গে তিনটি শিশুপুত্র—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথ। আকুল আর্তিতে স্বামীকে বললেন—আমাকে ছাড়িয়ে কোথায় যাইবে? যদি যাইতেই হয়। তবে আমাকে সঙ্গে করিয়া লও।

সাধ্বী রমণীর এই করুণ প্রার্থনা উপেক্ষা করতে পারলেন না মহর্ষিদেব। দুটি বজরা ভেসে চলল নবদ্বীপের দিকে—একটিতে শিশু সন্তানদের নিয়ে সারদাদেবী আর একটিতে সবান্ধব দেবেন্দ্রনাথ। ঘটনাটি অকিঞ্চিৎকর হলেও, আর্তির ব্যঞ্জনায় মুগ্ধ হলেন দেবেন্দ্রনাথ। তাঁর বিশাল আত্মজীবনীতে সারদাদেবীর নামোল্লেখ না করলেও, এই করুণ চিত্রটি তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না।

সারদাদেবী দেবেন্দ্রনাথের শুধু সহধর্মিণী নন, সহমর্মিণীও ছিলেন। পত্নীকে অসাধারণ শ্রদ্ধা করতেন দেবেন্দ্রনাথ। তিনি তাঁকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, কখনও তাঁর ওপর নিজের ধর্মমত আরোপ করার চেষ্টা করেননি। সারদাদেবী ধীরে ধীরে স্বামীর ধর্মীয় মতবাদের দিকে আকৃষ্ট হন এবং স্বামীর সুদীর্ঘকাল ব্যাপী আধ্যাত্মিক সংগ্রামে আত্মনিবেদন করেন।

সারদাদেবী ছিলেন বিশাল পরিবারের সর্বময় কর্ত্রী। তিনি ঠাকুরবাড়ির

অনেক ঐশ্বর্যই দেখে গেছেন, শুধু যেতে পারেননি আপন সন্তানদের পরিপূর্ণ রূপ। দ্বিজেন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ তখন যদিবা প্রকাশোন্মুখ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-স্বর্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথ তখন ভস্মাচ্ছাদিত। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন রত্নগর্ভা জননী বিরল।

কিন্তু এহেন জননী তাঁর সন্তানদের রচনায় আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত। হয়তো এই আক্ষেপই প্রকারান্তরে প্রকাশিত হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কবিতায়—

যে—জননী মৃদুহাসি সব দুঃখ ভুলি
উপাদেয় নানা অন্ন মুখে দেন তুলি;
এমন মায়েরে ভোলে যে কোন সন্তান।
নিশ্চয় হৃদয় তার পাষান-সমান।

কিন্তু এহো বাহ্য। মহীয়সী জননী অপন সন্তানদের সমস্ত সত্তা ঘিরেই বিরাজ করতেন, তাই স্বতন্ত্রভাবে আর তাঁকে স্মরণ করার প্রয়োজন হয়নি। সন্তানরাই তো জননীর জীবন্ত স্মরণিকা!

রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যে জননীর কথা খুব বেশি নেই। প্রথমত তিনি মানুষ হয়েছিলেন ভৃত্যরাজতন্ত্রে, তার ওপর সারদাদেবী শেষ জীবনে অসুস্থ থাকায় জননীকে তিনি খুব বেশি কাছেও পাননি। তিনি নিজেই বলেছেন—আমরা জন্মেছিলুম স্ত্রীলোকহীন জগতে। আর তিনি যখন মাত্র চোদ্দ বছরের বালক, তখনই সারদাদেবী পরলোকগমন করেন। রবীন্দ্রনাথকে মানুষ করেছিলেন অগ্রজা সৌদামিনী দেবী। হয়তো এই অভিমানেই রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বলেছেন—মার ঝোঁক ছিল জ্যোতিদাদা ও বড়দার উপরেই। আমি ছিলাম তাঁর কালো ছেলে!' সত্যেন্দ্রনাথও লিখেছেন—মার কাছে আমরা বৌক্ষণ থাকতুম না—আমাদের আসল আড্ডা ছিল মেজ কাকিমার ঘর।

সারদাদেবী ছিলেন অসাধারণ রমণী। ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরের মানসম্ভ্রম ও আভিজাত্য রক্ষায় তিনি যে দায়িত্ব পালন করেছেন, তার তুলনা নেই।

রাজনারায়ণ বসু ও কেশবচন্দ্রের পত্নী জগমোহিনী দেবী তাঁর এই গৌরবময় ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহলের এই অগ্নিবলয় থেকেই এক একটি অগ্নিশিখা বিচ্ছুরিত হয়ে চতুর্দিক আলোকিত করেছে। তিনি খুব বেশি লেখাপড়া জানতেন না বটে, কিন্তু তাঁর বিদ্যানুরাগ কম ছিল না। স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন—'মাতা ঠাকুরাণী ত কাজকর্মের অবসরে সারাদিনই একখানি বই হাতে লইয়া থাকিতেন। চাণক্যশ্লোক তাঁহার বিশেষ পাঠ্য ছিল, প্রায়ই বইখানি লইয়া শ্লোকগুলি আওড়াইতেন। তাঁহাকে সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনাইবার জন্য প্রায়ই কোন না কোন দাদার ডাক পড়িত।

সারদাদেবী ছিলেন স্নেহ ও মমতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা-জামাতা, আত্মীয়-পরিজন, দাস-দাসী পরিবেষ্টিত বিশাল সংসারের সমস্ত বিষয়ে তাঁর নজর থাকত। পুত্রবধূদের প্রতি তাঁর স্নেহ কিভাবে প্রসারিত হত, তার একটি উজ্জ্বল চিত্র আছে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর স্মৃতিকথায়—''আমার একমাথা ঘোমটার ভিতর দিয়ে তাঁহার সেই সুন্দর চাঁপার কলির মত হাত দিয়ে ভাত খাওয়াতেন।' মহর্ষিদেব বাড়ীতে থাকলে সব ছেলেরা শুয়ে পড়ার পর সারদাদেবীর আতর মেখে স্বামী সন্নিধানে যাওয়ার কথাও আছে এই স্মৃতিকথায়।

সারদাদেবী প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যে খুব বেশি প্রকাশিত না হলেও, তিনি প্রচ্ছন্নভাবে বহুস্থানে আছেন। মাতা-পুত্রের সেই প্রচ্ছন্ন চিত্রমালা হল রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্য। শিশুকাব্যের কবিতাগুলি সবই কোন খোকাকে নিয়ে লেখা, কবিবন্ধু মোহিতচন্দ্র সেনের পত্নী কবিকে একবার এই প্রশ্ন করলে তিনি লেখেন—'আমার এই কবিতাগুলি সবই খোকার নামে তার একটি প্রধান কারণ এই, যে ব্যক্তি লিখছে সে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে খোকাই ছিল, দুর্ভাগ্য ক্রমে খুকি ছিল না। তার সেই খোকাজন্মের অতি

প্রাচীন ইতিহাস থেকে যা কিছু উদ্ধার করতে পেরেছে তাই তার লেখনীর সম্বল—খুকির চিত্র তার কাছে সুস্পষ্ট নয়। শিশুকাব্যের অন্তরালেও এই সত্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে—

আঁধার রাতে চলে গেলি তুই,
আঁধার রাতে চুপি চুপি আয়।

স্মৃতির পাতা ওল্টাতে তিনি দেখতে পেয়েছেন সেই উজ্জ্বল ছবি—'মনে পড়ে ঘরটি আলো, মায়ের হাসিমুখ।'

জননীকে কেন্দ্র করে খোকার সমস্ত সাধ-আহ্লাদের কথাই আছে এ কাব্যে। বহুদিন পরে কবির মনে হয়েছে—

আমি বলি 'মা যে চেয়ে থাকে
সন্ধে হলে নাম ধরে মোর ডাকে
কেমন করে ছেড়ে থাকব তাকে।

কিন্তু এই বিচ্ছেদ কবিকে ব্যথা দিতে পারেনি, তিনি তৃপ্তি পেয়েছেন এক আশ্চর্য অনুভূতিতে—'মায়ের চুমোখানি যেন মুক্তো হয়ে দোলে।'

জননীর প্রতি কবির এই আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা রবীন্দ্রকাব্যের বহু স্থানে আছে। তিনি স্বীকার করেছেন—আমার জীবন সে তো তব আশীর্বাদ। অন্যত্র আছে—

হে জননী, ফুরাবে না তোর যে দান
শিরার শোণিতে যাহা চির বহমান।

রবীন্দ্রনাথ জননীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিশ্বজননীকে, আবার বিশ্বজননীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন জননীকে। এই অন্তহীন মাতৃত্বের প্রতি পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে তিনি বলেছেন—

ওগো মা, তোমারি মাঝে বিশ্বের মা যিনি
ছিলেন প্রত্যক্ষ বেশে জননী রূপিনী।
সেদিন যা কিছু পূজা দিয়েছি তোমায়

সে পূজা পড়েছে বিশ্ব জননীর পায়।
আজি সে মায়ের মাঝে গিয়েছে, মা চলি,
তাঁহারি পূজায় দিনু তব পুষ্পাঞ্জলি।

মাতৃবন্দনা পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা গীতাঞ্জলির 'জননী তোমার করুণ চরণখানি' গীতি কবিতাটি।

জননী সারদাদেবী ছিলেন স্নেহ ও করুণার প্রতিমূর্ত্তি। তিনি যেমন সীমাহীন ঐশ্বর্যের কর্ত্রী ছিলেন, তাঁর স্নেহধারাও তেমনি ছিল অফুরন্ত। কিন্তু তাঁর সরলতার অন্তরালে যে বিরাটত্ব ছিল, সেটি অবনীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্চর্য ভাষায় তুলে ধরেছেন—'আমার স্পষ্ট মনে আছে কর্তা দিদিমার সে ছবি, ভিতর দিকের তেতলার ঘরটিতে থাকতেন। ঘরে একটি বিছানা, সেকেলে মশারি সবুজ রঙের, পঙ্খের কাজ করা মেঝে, মেঝেতে কার্পেট পাতা, একপাশে একটা পিদিম জ্বলছে—বালুচরী শাড়ী পরে সাদা চুলে লাল সিন্দুর টকটক করছে—কর্তাদিদিমা তক্তাপোষে বসে আছেন।'

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ এই মহীয়সী জননী পরলোকগমন করেন। তাঁর হাতে ক্যানসার হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ তখন ডালহৌসী পাহাড়ে ছিলেন। কিন্তু ধর্মপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রী বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন—'কর্ত্তার পায়ের ধুলো মাথায় না নিয়ে মরবো না। সারদা দেবীর অবস্থা যখন খুবই খারাপের দিকে, ঠিক তখনই দেবেন্দ্রনাথ গৃহে ফেরেন। স্বামীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে দেহত্যাগ করেন সারদা দেবী। দেবেন্দ্রনাথ নিজ হাতে ফুল-চন্দন অভ্র দিয়ে পত্নীর শেষ শয্যা সাজিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—'ছয় বৎসরের সময় এনেছিলাম, আজ বিদায় দিলেম।'

দেবেন্দ্রনাথের নিরাসক্ত পার্থিব জীবনে পত্নীর মৃত্যু যে কি তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল, তার কোন বিবরণ নেই। তবে স্ত্রী বিয়োগ ব্যথার আভাস আছে তাঁর উক্তিতে। পত্নী বিয়োগের অল্প কয়েকদিন পরে ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজে

বর্ষশেষের উপাসনায় আচার্যের ভাষণে তিনি বলেন—এই পৃথিবী যে আকাশ দিয়া একবার চলিয়া গেল, তাহা সে আকাশে চলিবে না। যে স্রোত নদী দিয়া চলিয়া গেল, তাহা আর ফিরিবে না। যে সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছি তাহা আর আসিবে না। কালের স্রোত চলিয়া যাইতেছে।

সারদা দেবীর ইহজীবন যেমন নির্মল সুন্দর ছিল, মৃত্যুর পরেও সে দেহ এতটুকু মলিন হয়নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর সে দেহে তাহার কোন প্রমাণ ছিল না। সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তি মতোই প্রশান্ত ও মনোহর।'

জননী শবানুগমনের কথাও লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ—'আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম, তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এমন একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকন্নার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না।

রবীন্দ্রনাথের বিরাট এবং বিশাল জীবনে জননীর লৌকিক উপস্থিতি এইখানে সমাপ্ত। কিন্তু তাঁর মনপ্রাণ আচ্ছাদিত ছিল জননীর স্নেহ ও সুখস্বপ্ন দিয়ে। জননীর মৃত্যুর সুদীর্ঘকাল পরেও তিনি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। তিনি যেন জননীকে প্রণাম করছেন, আর জননী গভীর স্নেহে তাঁকে কাছে টেনে বলছেন—তুমি এসেছো! স্বপ্নটি কবির মনে গভীর দাগ কাটে এবং তিনি ১৩১৫ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতন মন্দিরে আচার্যের ভাষণে প্রসঙ্গত এই কথা উল্লেখ করেছিলেন।

জননীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা যে কি অপরিসীম ছিল, তা তাঁর আশ্চর্য অনুভূতিতেই সুস্পষ্ট—'যখন বসন্ত প্রভাতে একমুঠো অনতিস্ফুট মোটা মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া খ্যাপার মতো বেড়াইতাম, তখন সেই কোমল চিক্কন কুঁড়িগুলি ললাটের উপর বুলাইয়া প্রতিদিনই আমার মায়ের শুভ্র

আঙুলগুলি মনে পড়িত। আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম, যে স্পর্শ সেই সুন্দর আঙুলের আগায় ছিল, সেই স্পর্শেই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির মধ্যে নির্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে; জগতে তাহার আর অন্ত নাই, তা আমরা ভুলি বা মনে রাখি।

মাতৃস্মৃতির এই অভিজ্ঞানের প্রতি কবির সশ্রদ্ধ ভাবটি তাঁর কাব্যেও প্রতিফলিত হয়েছে—

সেই চাঁপা সেই বেলফুল
কে তোরা আজি এ প্রাতে এনে দিলি মোর হাতে
জল আসে আঁখি পাতে, হৃদয় আকুল।
সেই চাঁপা। সেই বেলফুল।

বিবেকানন্দ-জননী ভুবনেশ্বরী দেবী

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

এই বাণী শুধু উচ্চারণ নয়। স্বামী বিবেকানন্দ এই মন্ত্রকে জীবনে প্রতিমূর্তি করারও তপস্যা করেছিলেন। ভারতবর্ষের এই মহানপুত্রকে যিনি গর্ভে ধারণ করেছিলেন, সেই মহীয়সী জননী ভুবনেশ্বরী দেবীও অসামান্যা নারী ছিলেন।

ভুবনেশ্বরী দেবী ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার এক বিখ্যাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শিমুলিয়ার বিখ্যাত দেওয়ান ভবানীচরণ বসুর পৌত্র নন্দলাল বসুর একমাত্র সন্তান হলেন ভুবনেশ্বরী। রামতনু বোস লেনে অবস্থিত বসু পরিবারের বসত বাটিটি সেকালে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল বলে পরিগণিত হত। মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু ছিলেন ভুবনেশ্বরী দেবীর জ্যেঠতুত ভাই।

রূপেগুণে অসামান্যা ভুবনেশ্বরী দেবী যখন গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রিটে রামমোহন দত্তের সুবিশাল প্রাসাদে বধূ হয়ে আসেন, তখন তিনি বালিকা মাত্র। পাত্র বিশ্বনাথের বয়স তখন ষোলবছর, কিন্তু তখনই তাঁর রূপগুণ প্রকাশিত হতে শুরু করেছে।

সুঠাম সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বিশ্বনাথ সত্যিই অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। উদার, প্রাণোচ্ছল, শিক্ষিত, মার্জিত বিশ্বনাথ জাতিভেদ মানতেন না, তিনি ইংরেজী-বাংলা-উর্দু-আরবী-ফার্সি-সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন। জ্যোতিষ ও সঙ্গীত শাস্ত্রেও তিনি পারদর্শী ছিলেন, তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনে

সকলে মোহিত হত। তিনি সাহিত্য চর্চা করতেন, 'সুলোচনা' নামে একখানিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি খুড়তুতো ভাই গোপালচন্দ্রের নামে প্রকাশিত হয়ে সমাদৃত হয়েছিল। কর্মজীবনেও তাঁর সাফল্য ছিল, এটর্নী হিসাবে তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

কিন্তু এত কিছু পেয়েও ভুবনেশ্বরী দেবী সংসার সুখ উপভোগ করতে পারেননি। শৈশবে পিতৃদেব গৃহত্যাগী হওয়ায় বিশ্বনাথকে মানুষ করেছিলেন তাঁর কাকা-কাকীমা। ধর্মপ্রাণ বিশ্বনাথ এঁদের প্রতি এত কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছেন, যার প্লাবনে ভুবনেশ্বরী দেবীর সমস্ত সুখ-শান্তি ভেসে গেছে। এঁদের হাতে ভুবনেশ্বরী দেবীর দুর্গতির সীমা পরিসীমা ছিল না। তিনি ক্ষুধায় অন্ন পেতেন না, পরণে বস্ত্র পেতেন না, তার ওপর প্রতিনিয়ত সহ্য করতেন অকথ্য গালিগালাজ। ভুবনেশ্বরী দেবী কিন্তু সমস্ত বেদনা নীরবে সহ্য করতেন। স্ত্রীর এই দুঃখ দেখে একবার বিশ্বনাথও আক্ষেপ করে বলেছিলেন—'আমি এত টাকা রোজগার করি আর আমার স্ত্রী পেট ভরে খেতে পায় না।' বিশ্বনাথের মৃত্যুর পরেই তাঁরা অসহায় ভুবনেশ্বরী দেবীকে সম্পত্তিচ্যুত করেছিলেন। জননী সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন—'পারিবারিক কর্ত্তব্যেপ যুপকাষ্ঠে তিনি সারাজীবন দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন।

ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন ধর্মপ্রাণা মহিলা। তাঁর প্রথম পুত্র প্রাণত্যাগ করে এবং তারপর পরপর চারটি কন্যা হওয়ায় তিনি পুত্র প্রার্থনা করে শিবমন্দিরে কঠোর কৃচ্ছ্রব্রতে দিন কাটিয়েছিলেন। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের কাছেও তাঁর প্রার্থনা জানিয়ে পুজো পাঠিয়েছিলেন। সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর সম্ভবত জননীর এই প্রার্থনা স্বকর্ণে শুনেছিলেন। বহুপুণ্যে ভুবনেশ্বরী দেবী নরেন্দ্রনাথকে পুত্ররূপে পেয়েছিলেন। জীবরূপে শিব আবির্ভূত হন তাঁরই জঠরে।

নরেন্দ্রনাথ থেকে স্বামী বিবেকানন্দ উত্তরণের গৌরবময় অধ্যায়ে জননী ভুবনেশ্বরী দেবীরও একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এই পুণ্যবতী জননীর স্নেহ ও শাসনের মধ্যেই বিবেকানন্দ পালিত হয়েছিলেন। তিনি একদিকে যেমন মধুর ভাষিণী ছিলেন, অপর দিকে তেমনি ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। তিনি অত্যন্ত কম কথা বলতেন। তাঁর তেজস্বিতায়, আভিজাত্যের এমন একটা গৌরব ফুটে উঠত, যার গুণে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন।

তাঁর সামনে কোন মহিলা সহজে প্রগলভা হতে পারতেন না। তিনি নিয়মিত রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন এবং পুত্রদেরও শোনাতেন। এই প্রভাব তাঁর কৃতী পুত্র নরেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথের মননে যে ভিত্তিমূল রচনা করে—তারাই প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌরভে পরবর্তীকালে চতুর্দিক আমোদিত হয়েছে।

ভুবনেশ্বরী দেবীর সাহিত্যবোধ ছিল, তিনি বাংলায় কবিতাও লিখতেন। তিনি অল্প অল্প ইংরেজি জানতেন। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন—'আমাদের সকল ভাই-ই মায়ের কাছে প্যারীচরণ সরকারের ফার্ষ্টবুক অব রিডিং পড়তে শিখেছি।' নিবেদিতার সঙ্গে তিনি ইংরেজিতে কথাও বলতেন।

ভুবনেশ্বরী দেবীর কোমলতার অন্তরালে একটি তেজস্বিনী সত্তা সদা জাগ্রত থাকত। অসত্য, অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদা সদর্পে প্রতিবাদ করতেন। তাঁর তিন পুত্রের মধ্যেও রত্নগর্ভা জননীর এই তেজ সঞ্চারিত হয়। জননীর এই তেজস্বিনী ভাবের কথা স্মরণ রেখেই সম্ভবত বিবেকানন্দ পরবর্তীকালে নিবেদিতাকে বলেছিলেন—'পুরুষ নয়, সিংহবাহিনীর মতো শক্তিময়ী একটি নারী চাই।'

মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল ভুবনেশ্বরী দেবীর। তিনি স্বামীর ঐশ্বর্যে যেমন ভেসে যাননি, তেমনি তাঁর মৃত্যুতে (১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৪) নাবালক সন্তানদের নিয়েও ভেঙে পড়েননি। জননীকে দেখেই সম্ভবত বিবেকানন্দ লিখেছেন—নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে।

বিবেকানন্দ জননী যেমন স্নেহ করতেন, জননীর ওপর বিবেকানন্দেরও তেমনি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণের পরও তিনি মাঝে মাঝে বাড়ি এসে জননীকে দেখে যেতেন। শৈশবে বিবেকানন্দের একবার কঠিন অসুখ করলে জননী পুত্রে আরোগ্য কামনা করে কালীঘাটের মন্দিরে পুত্রকে গড়াগড়ি খাওয়াবেন বলে মানত করেন। পরে সেকথা তিনি বিস্মৃত হন। বিবেকানন্দ একসময় অসুস্থ হওয়ার সংবাদ পেয়ে তিনি পুত্রকে সেকথা লেখেন। জননীর আদেশ পাওয়ামাত্র বিবেকানন্দ কালিঘাটে গিয়ে মানত

রক্ষা করেন। চিকাগো থেকে একবার একটি পত্রে (২৯শে জানুয়ারী, ১৮৯৪) তিনি লিখেছিলেন—'এই বিপুল সংসারে আমার ভালবাসার পাত্র যদি কেউ থাকেন, তবে তিনি আমার মা।'

ভুবনেশ্বরী দেবীর জীবন ছিল ত্যাগ ও তিতিক্ষার দৃষ্টান্তস্বরূপ। বস্তুতপক্ষে তিনি তিন পুত্রকেই দেশের স্বার্থে নিয়োজিত করেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দেশহিতৈষী তিন কৃতী পুত্রের জননী হিসেবে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় জলপ্লাবনের সময় তিনি নিজেও দুর্গতদের জন্য খাদ্য পাঠিয়ে দেশসেবা করেছিলেন। বিপ্লবী মহেন্দ্রনাথ ও ভূপন্দ্রনাথের দেশসেবায় দীক্ষালাভ হয় জননীর হাতেই। ভূপেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন—'দেশের জন্য আমি তাকে উৎসর্গ করেছি।' জননীর এই উক্তিই ছিল ভূপেন্দ্রনাথের প্রেরণার উৎস। কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে সভাপতি রাসবিহারী ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন 'বাংলাদেশের বর্ষীয়সী মহিলারা পর্যন্ত দেশের কাজে এগিয়ে আসছেন।' এই মন্তব্যের অন্তরালে ছিল ভুবনেশ্বরী দেবীর বহুমুখী কর্মধারা।

এই গৌরবময় ভূমিকার জন্যে ভুবনেশ্বরী দেবী দেশবাসীরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে 'যুগান্তর'-সম্পাদক তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ভূপেন্দ্রনাথের কারামুক্তিতে ডাঃ নীলরতন সরকারের কলকাতা হ্যারিসন রোডের বাসভবনে ভুবনেশ্বরী দেবীকে অভিনন্দিত করা হয়। এজন্যে ভূপেন্দ্রনাথ জননীকে বলেছিলেন—'বিবেকানন্দের মা হয়ে তো তুমি কোন স্বীকৃতি পেলে না, কিন্তু আমার মা হয়ে তুমি জন-সম্বর্ধনা লাভ করেছ!'

২৪শে শ্রাবণ ১৩১৪ বঙ্গাব্দের অনুষ্ঠিত ঐ সম্বর্ধনা সভায় ভুবনেশ্বরী দেবীকে রৌপ্যাধারের মধ্যে রেশমী কাপড়ে লেখা একটি মানপত্র অর্পণ করা হয়, তাতে লেখা ছিল—

যতোধর্মস্ততোজয়ঃ

সময়োজিত সম্ভাষণ পুরঃসর নিবেদন,

আমরা কতিপয় বঙ্গনারী যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদভার লইয়া আপনাকে অভিনন্দিত করিতে আসিয়াছি। আপনার পুত্র অকুণ্ঠিত সাহসভরে স্বদেশের সেবা করিতে গিয়া রাজদ্বারে যে নিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আমরা

প্রতি বঙ্গনারী অসীম গৌরব অনুভব করিতেছি। পতিত জাতির ক্ষীণ পুণ্যহৃত ধর্ম ও লুপ্ত গৌরব পুণরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া রাজদ্বারে যে তীব্র অপমান বহন করিয়াছেন, তখন সে নিগ্রহ উজ্জ্বল আলোকমালায় জাতীয় জীবনের শোভা বর্ধন করিয়া থাকে। বিধাতার শুভ বরে আপনার পুত্র অদ্য যে সহনীয় আভরণ অর্জন করিয়া আনিয়াছেন, তাহার দীপ্তিতে কেবল আপনার কুল নহে—সমগ্র বঙ্গদেশ আলোকিত হইয়াছে। এরূপ সন্তানের জন্মে কুল পবিত্র, জননী ধন্যা ও জন্মভূমি আলোকিত হইয়া থাকেন। আপনার পুত্রের ন্যায় নির্ভীক স্বদেশ সেবক পুত্র প্রতিবঙ্গনারীর অঙ্গে অবতীর্ণ হউন, এই আশীর্বাদ অদ্য আমরা বিধাতার নিকট ভিক্ষা করিতেছি। ইতি 'বঙ্গ মহিলাগণ'।

কষ্ট সহ্য করার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল ভুবনেশ্বরী দেবীর। অথচ শৈশবে তিনি আদরের দুলালী হয়েই প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তাঁর চার পুত্র ও ছয় কন্যার মধ্যে সাতটি সন্তানের মৃত্যু হয় তাঁরই জীবিতাবস্থায়। ভাগীরথী তীরে তাঁর প্রাণাধিক পুত্র বিবেকানন্দের প্রজ্জ্বলিত চিতার পাশে অকম্পিতভাবে দাঁড়িয়ে তিনি শেষ প্রার্থনায় যোগ দিয়েছিলেন। কর্তব্যবোধে তাঁর কখনও চিত্ত চাঞ্চল্য হত না। শারীরিক ক্লেশ স্বীকারেও তিনি পরান্মুখ ছিলেন না, তীর্থযাত্রায় মাইলের পর মাইল তিনি পদব্রজে যাতায়াত করতেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি পুরী থেকে তীর্থ করে এসেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ-মহেন্দ্রনাথ এবং ভূপেন্দ্রনাথের বিশাল কর্মজীবন অনুধ্যান করলে জননী ভুবনেশ্বরী দেবীর এই সব গুণাবলীর সন্ধান পাওয়া যাবে।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই মেনিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে এই মহীয়সী জননীর দেহান্ত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল-জননী প্রসন্নময়ী দেবী

নদীয়া শান্তিপুরের যে বংশে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সহযোগী শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য এবং প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন, দ্বিজেন্দ্রলাল-জননী প্রসন্নময়ী দেবীও সেই পুণ্যবংশের সন্তান। তাঁর সহোদর কালাচাঁদ গোস্বামীও একজন সাধক ছিলেন।

প্রসন্নময়ী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা হন দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের সঙ্গে। শুধু নামেই নয়, কার্তিকেয় চন্দ্র রূপে গুণেও অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। শিক্ষাদীক্ষা এবং মর্যাদার কথাই তো বলাই বাহুল্য। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন 'সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য, বিদ্বান।' কার্তিকেয় চন্দ্র তাঁর 'আত্মজীবন চরিতে' লিখেছেন—'আমার তৎকালীন ভাবী শ্বশুর আমাদের একজন জ্ঞাতির সহিত দুহিতার বিবাহ স্থির করিতে আসিয়া আমাকে দেখেন এবং বাটি প্রত্যাগত হইয়া আমাকে কন্যা সম্প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অন্যত্র আবার একথাও লিখেছেন—'আমার ভাবী স্ত্রী সুন্দরী না হইলেও তাঁহার জনক জননীর বংশ দেখিয়া আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল।

প্রসন্নময়ীর চরিত্রের মধ্যে আদর্শ হিন্দু রমণীর সমস্ত গুণই ছিল। তিনি স্নেহশীলা ও কোমলহৃদয়া ছিলেন তাঁর প্রকৃতিও ছিল অত্যন্ত সরল। অতিথি-স্বজনের প্রতি তাঁর আন্তরিক ব্যবহার সকলের প্রাণ স্পর্শ করত। পরনিন্দা কাকে বলে তিনি জানতেন না। কার্তিকেয় চন্দ্র যখন দেওয়ান পদ লভ করেন, তখন কৃষ্ণনগরে মহারানী ছাড়া তাঁর তুল্য গণ্যমান্য মহিলা আর

কেউ ছিলেন না। কিন্তু তিনি নিরহঙ্কারী ছিলেন। অভাবনীয় সুখ স্বাচ্ছন্দের গৃহিণী হয়েও, তিনি রান্নাবান্না, কাপড় কাচা সব কাজ নিজের হাতে করতেন।

শুধু সুখসম্পদেই নয়, তাঁর সামাজিক সম্মানও কিছু কম ছিল না। তাঁর স্বামী দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র যেমন খ্যাতিমান ছিলেন, তাঁর বাড়িতে তেমনি আসতেন সেকালের বাঙালী মণীষীরা। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেবচন্দ্র, দীনবন্ধু, মধুসূদন, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি সকলেই কার্তিকেয় চন্দ্রের বন্ধু। এই বিরল সান্নিধ্যালাভও কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

প্রসন্নময়ীর দাম্পত্য জীবনও অত্যন্ত সুখময় ছিল। তাঁর প্রথমা কন্যা সন্তানটি মারা গেলেও, তিনি জীবনে আর কোন অপত্য শোক পাননি। তাঁর সাত পুত্র এবং এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র-কন্যারা হলেন রাজেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রলাল, জ্ঞানেন্দ্রলাল, সুরেন্দ্রলাল, নরেন্দ্রলাল, হরেন্দ্রলাল ও দ্বিজেন্দ্রলাল এবং কন্যা মালতী। পুত্ররা সকলেই কৃতবিদ্যা ছিলেন। কন্যা মালতী দেবীও সৎপাত্রে পাত্রস্থ হন।

সন্তানদের ওপর প্রসন্নময়ীর স্নেহ ছিল অসাধারণ তাঁর কৃতী সন্তানেরা ছাত্রাবস্থায় যখন পড়াশোনা করতেন, তিনি ঘুমোতে পারতেন না। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে হয় পাখার হাওয়া করতেন, না হলে গায়ে হাত বুলোতেন। জননীর এই বাৎসল্য পুত্রদের অন্তরেও গভীর শ্রদ্ধার আসন প্রতিষ্ঠা করে। জননীকেও তাঁরা 'স্বর্গাদপী দেবী সদৃশ' বলে মনে করতেন।

জননীর এই স্নেহ দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য জীবনেও প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। 'ভীষ্ম' নাটকে তিনি লিখেছেন—

মাতৃনামে কত শক্তি তুমি কি বুঝিবে
কত অর্থ যাহা অভিধানে নাই
কত সুধা যাহা নাই ইন্দ্রের ভাণ্ডারে।

'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকেও মাতৃভক্তির কথা আছে। 'পরপারে' নাটকে সরযূর কণ্ঠে দ্বিজেন্দ্রলা লেরই অভিমত প্রতিধ্বনিত হয়েছে—

'ও রতন না হারালে ঠিক চেনা যায় না।'

জননীকে দ্বিজেন্দ্রলাল অসাধারণ ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। ছোট ছেলে হিসেবে জননীর কাছে সম্ভবত তিনি একটু বেশি স্নেহ পেয়ে থাকবেন। তাই জননীর প্রতি তাঁর আকর্ষণও একটু বেশি ছিল। তিনি নিজেও সেকথা উপলব্ধি করতে পেরে বলেছেন—

জানি না জননী কেন এত ভালবাসি।
দুঃখের পীড়নে মোর হৃদয় ব্যথিত হলে,
জানি না তোমারি কাছে কেন ধেয়ে আসি।
চাহিলে ও মুখ পানে, কেন সব ভুলে যাই
দূরে যায় কেন তাপ—দুঃখ তমোরাশি।

মাতাপুত্রের স্নেহের এই সুগভীর সম্পর্ক দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাতযাত্রার সময়ে বাধা হয় দাঁড়ায়। কার্তিকেয় যদি বা মত দেন, প্রসন্নময়ী কিন্তু কিছুতেই রাজী হননি। শেষ পর্যনত পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বুঝিয়ে বলতে তিনি নিমরাজী হন। কিন্তু বিদায় রাত্রিতে তিনি পুত্রের গলা জড়িয়ে ধরে সারারাত কেঁদেছিলেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন পুত্রের সঙ্গে ইহজীবনে হয়তো আর দেখা হবে না। জননীর আশঙ্কা কিন্তু মিথ্যে হয়নি। দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাতযাত্রার এক বছরের মধ্যেই কার্তিকেয় চন্দ্র পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর মাত্র এক ঘণ্টা আগে তিনি পুণ্যবতী সহধর্মিনীকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—'তোমার ভাবনা কি? তোমার সাত ছেলে; সর্বকনিষ্ঠ পুত্রও এম. এ. পাশ করিয়া বিলাত গিয়াছে।'

সতীসাধ্বী প্রসন্নময়ী কিন্তু এই আপ্তবাক্যে আশ্বস্ত হননি। তিনি পুত্রদের বলেন—'তোরা দেখিস, আমি এক বছরের মধ্যেই তোদের পিতার অনুগমণ করব।'।

তাঁর কথা মিথ্যে হয়নি। সত্যি সত্যিই এক বছরের মধ্যে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল ও মালতীদেবীকে দেখতে চেয়েছিলেন। ইচ্ছামৃত্যুর দিন প্রসন্নময়ী দেবী অত্মীয় স্বজন এবং পুত্রদের

সঙ্গে নবদ্বীপধামে যান এবং ভরা ভাদ্রের কুলপ্লাবী গঙ্গার পবিত্র জলস্রোতে দেহ নিমজ্জিত করেন। তারপর 'ওঁ গঙ্গা নারায়ণ বহ্ম' মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়।

স্নেহময়ী জননীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিদেশে গিয়েও দ্বিজেন্দ্রলাল জননীর করুণামাখা মুখখানি ভুলতে পারেননি। জননীর কথা স্মরণ করেই আশ্রয় নিয়েছিলেন মাতৃরূপিণী এক মহিলার কাছে। ইংরেজিতে যখন Lyrics of lnd কাব্য রচনা করেছেন, তখনও Stream কবিতায় মায়ের কথা স্মরণ করেছেন। স্রোতস্বিনী প্রহের মধ্যে দিয়ে যেন প্রবাহিত হয়েছে কবির আত্মকাহিনী—

Some Say, I'm eruel to have left
My mother love my loss to mourn.
But know they not how sore my heart
For her doth of in silence burn.

বিলাত প্রবাসে দ্বিজেন্দ্রলাল পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলেন, এবার জননীর অসুস্থতার সংবাদ পৌছাল। সংবাদ পেয়েই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। তারপর স্বদেশ অভিমুখে রওনা দেন। কিন্তু জাহাজেই তাঁকে এই প্রাণান্তকর সংবাদটি শুনতে হয়। প্রচণ্ড শোকের তাড়নায় দু তিন দিন তিনি অনাহারে অনিদ্রায় কাটান। পাগলের মত অস্থির হয়ে ওঠেন। তিনি নিজেই এ প্রসঙ্গে বলেছেন—'এই সময়ে আমার সমুদ্র জলে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা পর্যন্ত করিতে ইচ্ছা হইত; মনে হইত বুঝি মরিতে পারিলেই মাকে পাইব।' দেশে ফিরে এসে 'গঙ্গা স্তোত্র' রচনা করে তিনি মাতৃতর্পণ করেন। বেদনার অশ্রু দিয়ে লেখেন—

পরিহরি ভব সুখ দুঃখ মা শায়িত শয়নে
বরিষ শ্রাবণে, তব জল কলেরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে

মা ভাগীরথি, জাহ্নবী সুরধুনি, কল কল্লোলিনী গঙ্গে।

জনক-জননীর প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাবটি আমৃত্যু জাগরিত ছিল। তাঁর সাহিত্যে বহুস্থানে তা প্রকাশিত হয়েছে। পরিণত বয়সে তিনি আন্তরিক ভাবে স্বীকার করেছেন—

পেয়েছি বটে মাতার প্রেম, পিতা এক স্নেহ
বুঝেছি আমি—এমন আর আপন নহে কেহ।

আশুতোষ-জননী জগত্তারিণী দেবী

মাতৃভক্ত বাঙালি মনীষীদের মধ্যে বিদ্যাসাগর এবং স্যার গুরুদাসের মত আশুতোষ এবং চিত্তরঞ্জনও উল্লেখযোগ্য। আশুতোষের মাতৃভক্তি আজও কিংবদন্তীর মত উচ্চারিত হয়। যে নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা নিয়ে আশুতোষ প্রতিভার উচ্চমার্গে বিচরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তার অন্তরালে পিতা গঙ্গাপ্রসাদ এবং মাতা জগত্তারিণী দেবীর অনেক অবদান ছিল।

জগত্তারিণী দেবী কলকাতা নিবাসী কাঁসারীপাড়ার হরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর যখন বিবাহ হয়, তখনও গঙ্গাপ্রসাদ ছাত্র। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ছেন। গঙ্গাপ্রসাদের অনুজ রাধাপ্রসাদ পড়ছেন ইঞ্জিনীয়ারিং। কলকাতা বহুবাজারের মলঙ্গা লেনের একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন।

মলঙ্গা লেনের এই বাড়িতেই জগত্তারিণী দেবীর প্রথম সন্তান আশুতোষের জন্ম হয়। বংশে প্রথম পুত্র সন্তান হওয়াতে সকলেই আনন্দ লাভ করেন। সদাশিব মহাদেবের নামে সন্তানের নামকরণ করা হয় আশুতোষ।

আশুতোষের শৈশব অতিবাহিত হয় খুব স্বচ্ছলতার মধ্যে। সে সময় গঙ্গাপ্রসাদ চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রভূত খ্যাতি এবং অর্থ উপার্জ্জন করেন। কিন্তু ভোগৈশ্বর্যের মধ্যে নিমজ্জিত না-হয়ে গঙ্গাপ্রসাদ এবং জগত্তারিণী দেবী পুত্রের শিক্ষাদীক্ষার দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেন। আশুতোষের প্রতিভা ছিল জন্মগত, কিন্তু

সেই প্রতিভা যথোচিত বিকাশলাভ করে মাতাপিতার অতন্দ্রিত যত্ন এবং সতর্কতার মধ্যে।

সৌভাগ্যবশতঃ আশুতোষ সর্বগুণ সম্পন্ন জনক-জননী লাভ করেছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ যেমন আদর্শ পিতা ছিলেন, জননী জগত্তারিণী দেবীও তেমনি ছিলেন অসাধারণ মহিলা। তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব, উদারতা এবং পবিত্র অন্তর আশুতোষকে এমন নির্মল করে তোলে। সাধারণ মহিলাদের মত ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে জগত্তারিণী দেবী কালক্ষেপ করতেন না। তিনি বালক পুত্রকে উপদেশ এবং উৎসাহপূর্ণ কথাবার্তায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই শৈশবে আশুতোষের হৃদয়ে উচ্চাশার মূল সুদৃঢ় হয়।

গঙ্গাপ্রসাদের উত্তরোত্তর অর্থাগমে তাঁদের পারিবারিক অবস্থা আমূল পরিবর্তিত হয়। রসা রোডে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করে তাঁরা সেখানে উঠে যান। কিন্তু জগত্তারিণী দেবী জীবন অতিবাহিত করতেন অতি সাধারণ ভাবে।

সরলতা-স্বাভাবিকতার প্রতি আশুতোষও আশৈশব অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তিনি কেতাদুরস্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করলেও, বেশভূষায় ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ। তাঁর ধুতি-চাদর পরিহিত বেশভূষা দেখে বিদেশী শিক্ষকরা তাঁকে আদর করে 'সরল ছেলে' (Simple man) বলে ডাকতেন।

জগত্তারিণী দেবীর দুই পুত্র, এক কন্যা—আশুতোষ, হেমন্ত কুমার এবং হেমলতা দেবী। কনিষ্ঠ পুত্র হেমন্তকুমার এবং একমাত্র কন্যা হেমলতা দেবীর অকাল মৃত্যুতে শোক জর্জরিতা জননী একমাত্র পুত্র আশুতোষকে আঁকড়ে ধরেন।

আশুতোষের জীবনে জননীর স্থান ছিল সবার উচ্চে। জীবনে বহু খ্যাতি এবং প্রতিপত্তির অধিকারী হলেও, তাঁর জীবনে সর্বাপেক্ষা কাম্য ছিল জননীর আশীর্বাদ। জননীর আদেশ ব্যতীত জীবনে তিনি কোন কাজ করতেন না।

এ নিয়ে একবার একটি ভীষণ কাণ্ড হয়।

ইংলণ্ডের সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক অনুষ্ঠান হবে বলে তখন

পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন পড়ে গেছে। সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্যে ভারতবর্ষে সম্ভ্রান্ত এবং গণ্যমান্য লোকেদের যে তালিকা প্রস্তুত হয়, তাতে আশুতোষের নাম ছিল। লর্ড কার্জন সগর্বে সে সংবাদ আশুতোষের কাছে পাঠালেন। কিন্তু আশুতোষ-জননী জগত্তারিণীদেবী পুত্রকে সেখানে যাবার অনুমতি দিলেন না।

আশুতোষ তাঁর না-যাওয়ার কারণটা জানাতে, লর্ড কার্জন বিস্ময়ে বলেছিলেন—আপনার মাকে বুঝিয়ে বলুন যে, ভারত সম্রাটের প্রতিনিধি গভর্ণর জেনারেল তাঁকে যেতে আদেশ করেছেন।

তখন আশুতোষ উত্তর দিয়েছিলেন—তাহলে আমার মায়ের তরফ থেকে জানাই যে, তিনি কিছুতেই স্বীকার করেন না যে, তিনি ছাড়া তাঁর পুত্রকে অন্য কারো আদেশ করার অধিকার আছে।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে আশুতোষ যখন কলকাতা হাইকোর্টের জজ পদে অধিষ্ঠিত হন, তখনও স্বাধীনচেতা, দৃঢ়চরিত্রা জগত্তারিণী দেবী বাধা দিয়েছিলেন। পুত্র হাইকোর্টের জজ হোক—জননী এটা কোনদিনই চাননি। শেষপর্যন্ত জননীকে পুত্র অনেক কিছু বুঝিয়ে কোনক্রমে সম্মতি আদায় করেন।

পুণ্যবতী এই মহীয়সী রমণী উত্তরকালে অনেক প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে সমর্থন করেছেন। আশুতোষের আদরের কন্যা কমলার যখন বৈধব্য ঘটে, আশুতোষ সে-মূর্তি দেখতে পারবেন না বলে বিধবা বিবাহ দেবার মনস্থ করেন। গঙ্গাপ্রসাদ তখন লোকান্তরিত, জননীর আদেশ প্রার্থনা করতে তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ এপ্রিল জগত্তারিণী দেবী ইহলোক ত্যাগ করেন। সে সময় আশুতোষ কাছে ছিলেন না। তিনি শয্যাশায়ী থাকলেও, বিপদের কোন আশঙ্কা ছিল না বলে তিনি কাশিমবাজারে মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর সনির্বন্ধ অনুরোধে কাশিমবাজার যান। পরদিন তাঁর কাছে জননীর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছায়। পাগলের মত তিনি ছুটে আসেন। জননীর কাছে শেষ সময়ে থাকতে না পারলেও শ্মশানে সৎকারের সময় তিনি উপস্থিত হতে পেরেছিলেন।

আশুতোষের চরিত্রে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল—সরলতা, ঐকান্তিকতা, সংকল্পের দৃঢ়তা, সংযম এবং শৃঙ্খলাবোধ; সমস্ত গুণই তিনি জননীর কাছে লাভ করেছিলেন। নানান সদগুণের জন্যে জগত্তারিণী দেবীকে স্যার গুরুদাসও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।

চিত্তরঞ্জন-জননী নিস্তারিণী দেবী

ভোগবিলাসের শিখর থেকে নেমে এসে চিত্তরঞ্জন যে ত্যাগ ও তিতিক্ষায় সর্বত্যাগী বৈরাগী হতে পেরেছিলেন তার পিছনে জননী নিস্তারিণী দেবীর অবদান ছিল সর্বাধিক। আশৈশব তিনি সন্তানকে জীবনের সমস্ত রকম পুণ্যব্রতে দীক্ষা দিয়ে লালন পালন করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন যে মানুষকে নরনারায়ণ রূপে দেখতেন, এ শিক্ষাও তিনি পেয়েছিলেন জননীর কাছ থেকে।

নিস্তারিণী দেবীর সঙ্গে ভুবনমোহনের যখন বিয়ে হয়, তখন দাশ পরিবারের অবস্থা খুবই সাধারণ ছিল। কলকাতার পটলডাঙ্গা অঞ্চলে একটি বাসা বাড়িতে তখন তাঁরা থাকতেন। এখানেই চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয়। তারপর তাঁরা ভবানীপুর কাঁসাড়িপাড়া এবং এলগিন রোড হয়ে সব শেষে রসারোডের বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

কল্যাণময়ী নিস্তারিণী দেবী ছিলেন একজন আদর্শ জননী। তিনি ছিলেন ত্যাগ, তিতিক্ষা, প্রেম ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। তাঁর অন্তরে কোন কালিমা ছিল না। দীনদরিদ্রের কাহিনী শুনে তিনি কাঁদতেন। দু'হাতে দানধ্যান করেও তাঁর আশা পূর্ণ হত না। তাঁর দয়া প্রার্থীদের মধ্যে একটি অন্ধ সাঁওতাল ছেলে ছিল। নিস্তারিণী দেবী তাকে সব চেয়ে বেশি ভালবাসতেন তাকে খেতে দিয়ে হাত ধরে দেখিয়ে দিয়ে বলতেন—এটা ভাত, এটা তরকারি।

তিনি জাতিধর্ম মানতেন না। দাসদাসীরাও তাঁর কাছে অভিন্ন স্নেহ পেত। তাঁর সাজ-পোশাক ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে; বিলাসিতা কাকে বলে তিনি জানতেন না। অঙ্গে তিনি কখনও অলঙ্কার পরতেন না। সন্তানরাই তাঁর প্রকৃত ভূষণ-স্বরূপ ছিলেন।

নিস্তারিণী দেবী ছিলেন বিশাল একটি পরিবারের গৃহিণী। তাঁর নিজের আটটি সন্তানের সঙ্গে ভাসুর দুর্গামোহনের দুটি মাতৃহীন পুত্র সতীশ ও যতীশরঞ্জনকেও তিনি মানুষ করেছিলেন। তাঁরা কখনও বুঝতে পারেননি যে, নিস্তারিণী দেবী তাঁদের গর্ভধারিণী নন। ওদের না খাইয়ে তিনি কখনও চিত্তরঞ্জনকে খেতে দিতেন না। তিনি গরীব দুঃখীদের দানধ্যান করতেন সন্তানদের হাত দিয়ে, যাতে সেটি তাঁরা যথার্থভাবে শেখেন। প্রয়োজন হলে তিনি যে অকাতরে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারতেন, চিত্তরঞ্জনের পুণ্যজীবনে সে-সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

ভুবনমোহনের পরিবারে সকলেই ছিলে আইন ব্যবসায়ী। লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইন ব্যবসায়ী হলেও, বেহিসেবী দানধ্যানের জন্যে ভুবনমোহনকে শেষ পর্যন্ত দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল। সেদিন অকম্পিত হাতে সমস্ত অলঙ্কার তুলে দিয়ে নিস্তারিণী দেবী স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পিতৃঋণ শোধ করে চিত্তরঞ্জন জনক-জননীকে দেউলিয়া অপবাদ থেকে মুক্ত করেন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে। সেদিন খুশি হয়েছিলেন নিস্তারিণী দেবী। খবরের কাগজ খুলে কেবলই বলেছিলেন—আর একবার পড়তো, কি লিখেছে চিত্তর নামে।

নিস্তারিণী দেবী লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু সমস্ত সদগুণ দিয়ে গঠিত ছিল তাঁর অন্তর। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র প্রফুল্লরঞ্জনের ইংরেজপত্নী নিস্তারিণী দেবীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন— লেখাপড়া না শিখেও যদি আমার

শাশুড়ির মত এমন মানুষ হয়, তবে আমার মেয়েদের আমি লেখাপড়া শেখাব না।

চিত্তরঞ্জনের মাতৃভক্তি ছিল অতুলনীয়। তাঁর মাতৃভক্তি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র একস্থানে লিখেছেন—'দেশবন্ধু মাতৃরূপের অনুরাগী ছিলেন। পারিবারিক জীবনে তাঁহার মাতৃভক্তির কথা অনেকেই জানেন। আলিপুর জেলে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা প্রায়ই তিনি আমাদের পড়িয়া শুনাইতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা মায়ের তিনটি রূপের বর্ণনা পড়িতে পড়িতে তিনি বিভোর হইয়া যাইতেন। তখনও তাঁহাকে দেখিলে বোঝা যাইত মাতৃভক্তি কি গভীর!'

চিত্তরঞ্জনের জীবনে জননীর স্থান সকলের আগে। মা-কে তিনি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসতেন। মা-কে সুখী করার জন্যে তিনি সর্বস্ব দিতে পারতেন। প্রত্যেকদিন বাড়ি থেকে বেরোবার আগে তিনি মা-কে প্রণাম করতেন। সবকিছুর আগে মাকে জিজ্ঞেস করতেন। মা-কে বলা চাই সব কিছু। জননীর আশীর্বাদই ছিল তাঁর সমস্ত প্রেরণার উৎস। ঐতিহাসিক আলিপুর বোমা মামলায় শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে দাঁড়াবার জন্যে সকলে অনুরোধ করলেও, জননীর ঐকান্তিক আগ্রহই তাঁকে সবচেয়ে বৈশি উৎসাহিত করেছিল।

মায়ের হাতের রান্না ছিল তাঁর সর্বাধিক প্রিয়। মা খুব ভাল আমসত্ত্ব করতে পারতেন বলে গ্রীষ্মকালে তিনি জননীর কাছে হাজার টাকা দিয়ে রাখতেন। জননীর প্রতি তাঁর এই সর্বপ্রকার নির্ভরতার ভাবটি ছিল যথার্থভাবে কবিতায় প্রকাশ করেছেন—

তুমি যদি আলো করে থাক মা হৃদয় পরে,
দুঃখ মোর সুখ হবে, দূরে যাবে অন্ধকার।

চিত্তরঞ্জনের মাতৃভক্তি যেমন অপরিসীম ছিল, জননীরও তেমনি চিত্তরঞ্জনের ওপর আকর্ষণ ছিল সর্বাধিক। চিত্তর কথা তাঁর কাছে ছিল বেদবাক্য। চিত্ত বলেছে বললে তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে সেকথা মেনে নিতেন।

মৃত্যুশয্যায় তিনি স্বামীকে বলেছিলেন—যদি জন্মজন্মান্তর থাকে, আমাকে আবার আসতে হয়, তবে তোমাকে স্বামী আর চিত্তরে যে ছেলে পাই।

চিত্তরঞ্জনকে ঘিরেই জনক-জননীর দাম্পত্যজীবন মধুময় হয়ে উঠেছিল। চিত্তকে কেন্দ্র করেই তাঁদের সমস্ত চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত হত। তাঁদের পুরুলিয়ার বসতবাড়িতে একটি বড় বাগান ছিল। সেই বাগানের ফুলগাছের অংশটি ছিল ভুবনমোহনের আর তরকারি গাছের অংশটি ছিল নিস্তারিণী দেবীর তত্ত্বাবধানে। অধিকার ভঙ্গ নিয়ে দাম্পত্য কলহ দেখা দিলে তিনি স্বামীকে অনুযোগ করে বলতেন—দাঁড়াও, চিত্ত আসুক, এর একটা বিহিত করব।

নিস্তারিণী দেবীর তিনপুত্র—চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লরঞ্জন ও বসন্তরঞ্জন। তিনজনেই কৃতী ব্যারিষ্টার ছিলেন। চিত্তরঞ্জন ও বসন্তরঞ্জন আইন ব্যবসা করতেন আর প্রফুল্লরঞ্জন ছিলেন পাটনা হাইকোর্টের জজ। প্রতিপালিত দুই পুত্রপ্রতীম সতীশও যতীশরঞ্জনও ব্যারিষ্টার ছিলেন। তাঁর পাঁচ কন্যা—তরলা, অমলা, প্রমীলা, ঊর্মিলা ও মুরলা দেবীও বিদূষী ছিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের প্রতিভা ও কর্মধারা জনক-জননীর জীবনকে সর্বাধিক গৌরবময় করে তোলে।

কনিষ্ঠপুত্র বসন্তরঞ্জনের অকাল মৃত্যুতে নিস্তারিণী দেবী খুবই আঘাত পান। তারপর থেকেই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। পুত্রের মৃত্যুর মাত্র তিন বছর পরে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের রাসপূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে তিনি পুরুলিয়ায় দেহত্যাগ করেন। চিত্তরঞ্জন তখন বিলেতে। মায়ের তাগিদেই পুজোর ছুটিতে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে তাঁকে বিলেতে যেতে হয়েছিল। ঐ সময়ে জননীর ইচ্ছা ছিল যে চিত্তর সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। কেবলই বলতেন—চিত্ত ফিরেছে? মনে হল যেন কে আমাকে মা বলে ডাকল।

সংবাদ পাবা মাত্র চিত্তরঞ্জন স্বদেশ অভিমুখে রওনা দেন। কিন্তু তাঁর জাহাজ যেদিন বোম্বাই বন্দরে এসে পৌঁছায়, সেই দিনই নিস্তারিণী দেবী পরলোকগমন করেন। পুরুলিয়ায় এসে চিত্তরঞ্জন হিন্দুমতে মায়ের শেষ কাজ

করেন। তিন চার দিন ধরে দরিদ্র নারায়ণ সেবা হয়। তিনি নিজেও চণ্ডালের সঙ্গে একাসনে বসে আহার করেছিলেন। জননীর আত্মার তৃপ্তির জন্যে তিনি কিছু করতে বাকি রাখেন নি। জননীর পুণ্যস্মৃতিতে তিনি একটি মাতৃমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন।

নিস্তারিণী দেবীর মৃত্যুর পরে ভুবনমোহন মাত্র সাত মাস জীবিত ছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জনক-জননীর মৃত্যুর পর চিত্তরঞ্জনের মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি ধীরে ধীরে বৈষ্ণব ধর্ম ও কীর্তনে আকৃষ্ট হন। ঐ সময়ে রচিত তাঁর সমস্ত কবিতাই বৈরাগ্যের গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত। হয়তো এটাও ছিল তাঁর জনক জননীর প্রতি আত্মিক শ্রদ্ধার্ঘ্য।

অতুলপ্রসাদ-জননী হেমন্তশশী দেবী

অতুলপ্রসাদ জননী হেমন্তশশী দেবীর জন্ম হয়েছিল পূর্ববঙ্গের এক সম্ভ্রান্ত বংশে। তাঁর পিতা কালীনারায়ণ গুপ্ত সেকালের একজন প্রসিদ্ধ ধর্মসংস্কারক ছিলেন। লোকে তাঁকে মহর্ষি বলত। কালীনারায়ণের চার পুত্র—স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ, ডাঃ প্যারীমোহন, গঙ্গাগোবিন্দ ও বিনয়চন্দ্র। সকলেই কৃতবিদ্যা এবং খ্যাতনামা ছিলেন। পত্নী অন্নদা দেবীও ছিলে বিদূষী মহিলা।

হেমন্তশশী দেবী যখন সেন পরিবারের বধূ হয়ে আসেন, তখন তাঁদের অবস্থা ছিল খুবই উন্নত। স্বামী রামপ্রসাদ ছিলেন আশ্চর্য প্রতিভাসম্পন্ন একজন খামখেয়ালী মানুষ। প্রথম জীবনে তিনি শিক্ষকতা করতেন। সমাজ সংস্কারে নিবেদন করেছিলেন নিজের মন-প্রাণ। হঠাৎ কি খেয়ালে তিনি চলে আসেন কলকাতায়। তারপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় ভর্তি হন মেডিক্যাল কলেজে। সেখান থেকে ডাক্তারি পাশ করে তিনি আবার ফিরে যান ঢাকায়।

এই রামপ্রসাদ সেন আর হেমন্তশশী দেবীর প্রথম সন্তানই হলেন অতুলপ্রসাদ। অতুলপ্রসাদের যখন জন্ম হয় তখন রামপ্রসাদ ঢাকার পাগলা গারদের চিকিৎসক ছিলেন। ওষুধের স্বাধীন ব্যবসা করেও তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দের চেয়ে সমাজের উন্নতির দিকেই তাঁর বেশি নজর ছিল।

নিজের সম্পর্কে আশ্চর্য উদাসীন ছিলেন রামপ্রসাদ। ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজের একটি মন্দির নির্মাণ নিয়ে তিনি যখন বিভোর, তখনই তাঁর পিঠে একটি বড়

ফোঁড়া হয়। তিনি নিজেই সেটি অস্ত্রোপচার করেন। সেই রোগেই শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয়—১৬ই কার্তিক ১২৯১ বঙ্গাব্দে।

স্বামীর অকাল মৃত্যুতে হেমন্তশশী যখন বিধবা হন, তখন তাঁর চারটি নাবালক সন্তান। একমাত্র পুত্র অতুলপ্রসাদ আর তিনটি কন্যা—কিরণ, হিরণ এবং প্রভা। কালীনারায়ণ তখনও জীবিত তিনিই এসে কন্যাকে বাড়ি নিয়ে যান। সেখানেই হেমন্তশশীদেবীর সন্তানেরা লালিত পালিত হয়েছিলেন।

শৈশবে অতুলপ্রসাদ জননীকে শুধু সময়ের সঙ্গী হিসেবেই নয়, পেয়েছিলেন বন্ধু, শিক্ষিকা এবং পরিচালিকা হিসাবে। জননীর কাছেই তাঁর জীবনের সমস্ত অনুভূতি বিকশিত হয়। হেমন্তশশী দেবী তাঁর নয়নের মণি 'খোকন'কে প্রাণাধিক ভালবাসলেন। অতুলপ্রসাদের শিক্ষাজীবনও নির্ধারিত হয়েছিলেন জননীর আগ্রহে। আশৈশব তিনি অতুলপ্রসাদকে বলতেন—তোমাকে ব্যারিষ্টার হতে হবে, বিলেত যেতে হবে।

অতুলপ্রসাদ জীবনে জননীর এই কর্তব্যনিষ্ঠা প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। পিতা রামপ্রসাদের উদারতাও শৈশবে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। জীবনের স্নিগ্ধ অনুভূতিগুলির প্রতি পিতার আকর্ষণও অতুলপ্রসাদকে প্রভাবিত করে থাকবে। পিতার সমাজ সেবার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা পুত্রের উত্তর-জীবনকে গৌরবান্বিত করেছিল।

রামপ্রসাদ ছিলেন প্রগতিবাদী। তিনি বিধবাবিবাহের সমর্থক ছিলেন। জীবিত অবস্থায় একবার তিনি পত্নীকে বলেছিলেন—'এক স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুরুষেরা যেমন দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, সেরকম স্বামী বিয়োগের পর স্ত্রীরও দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণে কোন বাধা নেই। হেমন্তশশী দেবী সেদিন বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, স্বামীর এই মতাদর্শ তাঁর নিজের জীবনেও আশ্চর্যভাবে সত্য হয়ে উঠবে।

জননীর প্রতি অতুলপ্রসাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল অপরিসীম। কোন ব্যবহারেই তিনি জননীর বিরূপ হননি। জননীকে তিনি দেবীর আসনে বসিয়েছিলেন। তাঁর 'কয়েকটি গান' গ্রন্থের প্রথম কপিটি যেদিন তাঁর হাতে আসে সেদিন তিনি জননীর পাদপদ্মে নিবেদন করে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন।

জীবনের সমস্ত অবস্থায় তিনি জননীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন। জননীর ইচ্ছাপূরণ করার জন্যে তিনি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারতেন। জননীর প্রতি এই অপরিসীম শ্রদ্ধার জন্যে তিনি দাম্পত্যজীবনেও অনেক অশান্তি ডেকে আনেন। জননীর আদেশ ছিল তাঁর কাছে বেদবাক্য। আজীবন তিনি জননীর কাছে নিজেকে শিশুর মত মনে করে আনন্দ পেতেন। তাঁর এই মনোভাবটি তিনি একটি গানের মধ্যেও প্রকাশ করেছেন—

তোর কাছে আসব মাগো
শিশুর মতো
সব আভরণ ফেলব দূরে
হৃদয় জুড়ে আছে যত।

জননীর ইচ্ছাপূরণ করবার জন্য তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। কিন্তু হেমন্তশশী দেবী সেটি শেষ হবার আগেই পরলোকগমন করেন। মাতৃভক্ত অতুলপ্রসাদ এই গৃহের নামকরণ করেন—'হেমন্ত নিবাস'। জননীকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ছোটবোনদের সারাজীবন দেখবেন, আজীবন তিনি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন।

জননীর সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত উচ্চস্তরের। তিনি বলতেন—জননী সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত উচ্চস্তরের। তিনি বলতেন—'যে মা পেটে ধরেছেন, সে মা অন্য মায়ের চেয়ে একটু পৃথক। সে জননী, শুধু মা নয়।'

অতুলপ্রসাদের জীবন সরলতা এবং পরসেবা তাঁর জননীরই অবদান। তাঁর বিড়ম্বিত ভাগ্যাকাশে জননী হেমন্তশশী দেবী ছিলেন ধ্রুবতারার মত চির ভাস্বর।

পুত্রের অতুলঐশ্বর্য এবং সামাজিক খ্যাতির উত্তুঙ্গ চূড়া দেখে হেমন্তশশী দেবী ইহলোক ত্যাগ করেন, ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১৮ই বৈশাখ। অতুলপ্রসাদ সেদিন শিশুর মত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সে সময় তিনি পাগলের মত দিন কাটিয়েছেন। বন্ধ করেছেন সমস্ত স্বাভাবিক কাজকর্ম।

মাতৃশ্রাদ্ধ অতুলপ্রসাদ লক্ষ্ণৌ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে সহস্রাধিক দুঃস্থ

আতুরকে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পরিতৃপ্ত করান। সেই শ্রাদ্ধ বাসরে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গুরুদাস চক্রবর্তী। জননীর পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে তিনি 'হেমন্তশশী সেবা সদন' প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে।

জননীর প্রতি অতুলপ্রসাদের কি পরিমাণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল, শ্রাদ্ধবাসরে প্রদত্ত তাঁর ভাষণেই তা সুস্পষ্ট—'বিশ্বজননী! সংসারে পাইয়াছিও অনেক, হারাইয়াছিও অনেক, কিন্তু এবার সকলের চেয়ে অমূল্য সম্পদ হারাইলাম—মা। তুমি আমাকে সুখে বঞ্চিত করিয়াছ কিন্তু একটি পরম সুখে একদিনের জন্যও বঞ্চিত কর নাই—অপূর্ব মাতৃস্নেহ। আজ তাহা হইতেও বঞ্চিত করিলে। এক এক সময় মনে হয় এখন কি লইয়া থাকিব। কে আমাদের সকল সুখে সুখী, সকল দুঃখে দুঃখী হইবে? শৈশব হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে প্রৌঢ়াবস্থায়, প্রৌঢ়াবস্থা হইতে বার্ধক্যে আসিয়া পড়িলাম। মার কাছে চিরকাল শিশুই হইয়া রহিলাম। যখন 'মা' বলিয়া ডাকিতাম, আর মা যখন 'অতুল' বলিয়া ডাকিতেন, তখন ভুলিয়া যাইতাম যে এত বড় হইয়াছি। শৈশবে যেমন স্নেহের শাসন পাইতাম, সেদিনও সেইরূপ পাইয়াছি। আজ তেমন করিয়া শাসন করিবে কে? তেমন করিয়া সেবা করিবে কে? এই গৃহ রক্ষা করিবে কে? মাতৃহারা নিজের নিঃসম্বল মনে হইতেছে, বিশ্বজননী তুমি আমার সহায় হও।'

শ্রীঅরবিন্দ-জননী স্বর্ণলতা দেবী

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে যাঁরা চিহ্নিত, ঋষি নারায়ণ বসু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে তিনি সমাজের বহু জন হিতকর কাজ করেছেন। মেদিনীপুর তাঁর প্রথম জীবনের কর্মক্ষেত্র হলেও, শেষজীবনে তিনি দেওঘর-বাসী হন! তাঁর পূত চরিত্রের কথা স্মরণ করে সেখানকার লোকে তাঁকে 'দোসরা বৈদ্যনাথ' বলে সম্মান জানাত। সহাধ্যায়ী বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায় একবার নিজের গলা থেকে পৈতে খুলে রাজনারায়ণের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—'রাজনারায়ণ, তুমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তোমার তুলনায় আমরা কিছুই নয়!'

এই রাজনারায়ণের জ্যেষ্ঠাকন্যা স্বর্ণলতাই হলেন ঋষি অরবিন্দের জননী।

সেটা ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ। কোন্নগরের বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের এক কৃতী সন্তান কৃষ্ণধন তখন প্রথম যৌবনেই সংস্কারমুক্ত স্বাধীনচেতা মানুষ হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। সেই বয়সেই তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন নেতা রাজনারায়ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গুণমুগ্ধ রাজনারায়ণ তাঁর প্রথমা কন্যার পাত্র হিসেবে কৃষ্ণধনকেই মনোনীত করেন। কৃষ্ণধন তখন কলেজের ছাত্র, সবে এন্ট্রাস পাশ করে মেডিকেল কলেজে ঢুকেছেন।

বয়স উনিশ বছর আর স্বর্ণলতার তখন বারো। স্বাস্থ্যবান, রূপবান কৃষ্ণধনকে রাজনারায়ণ খুবই পছন্দ করলেন। তাঁর সুগভীর কালো চোখের অন্তরালে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে রাজনারায়ণ যেন পুলকিত হলেন। স্নেহের দান হিসেবে জামাতা কৃষ্ণধনকে উৎসর্গ করলেন তাঁর 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' গ্রন্থটি।

রাজনারায়ণের সে সময়ের কর্মস্থল ছিল মেদিনীপুর। সেখানেই বসল বিবাহ-বাসর। বিয়ে হল হিন্দুমতে নয়, ব্রাহ্মমতে। কলকাতা থেকে বিবাহ সভায় যোগ দিতে এলেন ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন নেতারা। এলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। অনুষ্ঠান কেমন হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—'মেদিনীপুরের সকল শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সমবেত হইলেন। সে অনুষ্ঠানের তরঙ্গ দেশের অপরার দূরবর্তী স্থানেও অনুভূত হইল।' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বললেন—'রাজ-রাজড়ার বিবাহে এমন হয় না।'

কৃষ্ণধনকে পেয়ে স্বর্ণলতার জীবন ভরে উঠল। ক' বছরের মধ্যে ডাক্তারি পাশ করে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলাত-যাত্রা করলেন। এর মধ্যে তাঁদের প্রথম পুত্র বিনয়ভূষণের জন্ম হল। মা-বাবার আদরের নাম হল—'বেনো'। বিলাত যাত্রার সময় কৃষ্ণধন 'বেনো'কে জননী স্বর্ণলতার কাছে রেখে গেলেন না। মিস প্যাজেট নামে একজন বিদেশিনীকে রেখে গেলেন। তাঁর মনে তখন ইউরোপীয় আচার পদ্ধতি প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। তাছাড়া আর একটি বড় কারণ ছিল—স্বর্ণলতার মধ্যে উন্মাদনার লক্ষণ দেখা দিল। বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন—'মা দাদার জন্মের পর শনৈঃ শনৈঃ পাগল হতে লাগলেন—।'

জামাতার বিদেশ যাত্রায় খুশি হলেন রাজনারায়ণ। আবেগের বশে কৃষ্ণধনকে সম্বোধন করে তিনি চার-চারটি ইংরেজি সনেট রচনা করে ফেললেন জামাতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

Go, son velov'd as pilgrim hold to lands
Beyond the stormy ocean's wide domain
Where Commerce, art and Science frecly rain
On free men blessing rare with lib'ral hands
Go, but still as ours remain.

কৃষ্ণধনের হাবেভাবে ঋষি রাজনারায়ণ হয়তো কিছু দেখতে পেয়েছিলেন, তাই স্বদেশীয় ভাবের ওপর আস্থা রাখতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণধন দু'বছরের মধ্যে এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম. ডি. পাশ করে আই-এম-এস হয়ে দেশে ফিরলেন পুরোদস্তুর সাহেব সেজে। কৃষ্ণধন ঘোষ হলেন প্রথম ভারতীয় আই-এম-এস ডক্টর কে-ডি-ঘোষ। রূপান্তরিত নামের অন্তরালে কোথায় হারিয়ে গেলেন অতীতের কৃষ্ণধন। সিভিল সার্জেনের চাকরি নিয়ে তিনি চলে গেলেন ভাগলপুরে। সেখানেই ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম হল দ্বিতীয় পুত্র মনোমোহনের—তাঁদের আদরের 'মোনো'র। ইংরেজি সাহিত্যে যিনি Poet Manmohan Ghosh বলে সম্মানিত।

আচারে এবং বেশভূষায় সাহেব হলেও, কৃষ্ণধনের অন্তরটি ছিল বাঙালী জননীর। দানধ্যানে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত, লোকে তাই তাঁর নতুন নাম দিল— 'দাতা কর্ণ'। কর্মস্থল হিসেবে যখন যেখানে গেছেন, সেখানেই তিনি লোকের নয়নের মণি হয়ে উঠেছেন। রংপুরে থাকার সময় তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেখে লোকে নাম দিয়েছিল 'রোজ অফ রংপুর' রংপুরের গোলাপ! রাজনারায়ণ লিখলেন—'তাঁহার মন অতিশয় মধুর। সেই মাধুর্য্য তাঁহা মুখশ্রীতে প্রতিফলিত হয়েছে।'

দেশে ফেরার কিছুদিন পরে ব্যারিষ্টার বন্ধু মনোমোহন ঘোষের বাড়িতে তাঁদের আর একটি পুত্র সন্তান হল। সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে এসে সাহেব পিতা নবজাতকের নাম রাখলেন—অরবিন্দ। হয়তো জনক হিসেবে তিনি তখনই সে-সুবাস পেয়ে থাকবেন।

এবারে তিন ছেলেকে দেখাশোনার জন্যে পরিচারিকা নিযুক্ত হল। জননীর

স্নেহময় দৃষ্টি থেকে সব সময়েই ছেলেদের দূরে রাখা হতে লাগল। স্বর্ণলতার ক্ষুব্ধ মাতৃহৃদয় হাহাকার করে উঠল। কিন্তু প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কৃষ্ণধনকে কিছু বলার উপায় নেই, বলে লাভও নেই। গর্ভের সন্তানদের বক্ষে ধারণ করতে না-পারার যে বেদনা, জননী স্বর্ণলতাকে তাই একা একা বহন করতে হল।

পরিণতি স্বভাবতই খারাপের দিকে গেল। মানসিক বিকৃতি ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। তখন কন্যা সরোজিনী তাঁর গর্ভে। কৃষ্ণধন বিচলিত হয়ে পড়লেন। স্থির করলেন বিলেতে তাঁর চিকিৎসা করাবেন। সরোজিনীর জন্মের দু'বছর পরে তাই সপরিবারে রওনা হলেন ইংলন্ড অভিমুখে। প্রায় সমুদ্রগর্ভে স্বর্ণলতার আর একটি পুত্র হ'ল—সাগরের সঙ্গে নাম মিলিয়ে নাম রাখা হল বারীন্দ্রকুমার। কিন্তু ইংলন্ডে চিকিৎসা করেও স্বর্ণলতা সুস্থ হলেন না। বেনো, মেনো আর আরোকে ইংলন্ডে রেখে কৃষ্ণধন দেশে ফিরে এলেন।

স্বর্ণলতার জীবনে দুভার্গ্যের ঘন মেঘ সঞ্চারিত হতে লাগল। স্বর্ণলতাকে রোহিনীতে রেখে কৃষ্ণধন কর্মস্থলে ফিরে গেলেন। মাঝে মধ্যে তিনি বাড়ি আসতেন বটে, কিন্তু দু'চারদিনের বেশি থাকতেন না। আনন্দের পেয়ালাটা তখনও শূন্য হয়ে যায়নি। কনিষ্ঠপুত্র বারীন্দ্রকুমার এই সময়ের একটি চমৎকার ছবি উপহার দিয়েছেন—'কলকাতায় থাকার সময়ে তাঁর সঙ্গে আমরা যেতুম গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে খোলা ফিটনে বসে। এই সময়টির জন্যে আমার tip top সাহেব বাবার পাশে মা বসতেন বুকখোলা গাউন পরে নানা ফুল-ফলে ভরা লেডিজ হ্যাট মাথায় দিয়ে রুমাল হাতে। সে বেশেও রূপসী মা আমার গড়ের মাঠ ও ইডেন গার্ডেন আলো করে চলতেন তাঁর সাম্রাজ্ঞীর বাড়া লাবণ্যে ও শ্রী-গরিমায়।'

এরপর থেকেই কৃষ্ণধন একটু একটু করে সরে যেতে লাগলেন। সেই সদা হাস্যময়, আনন্দ-মুখর মানুষটির জীবনের ভার যেন বাড়তে লাগল। সে অবস্থাটা ভুলে থাকার জন্যে কৃষ্ণধন মদ্য পানের মাত্রা বাড়ালেন, কিন্তু তাতে নিঃশেষ হয়ে গেলেন তিনি নিজেই। স্বামীকে সুপথে আনতে স্বর্ণলতার চেষ্টার

অন্ত ছিল না। হুইস্কির বোতল লুকিয়ে রাখতেন বলে পত্নীর কাছ থেকে দিনে এক আধ পেগ ভিক্ষা চাইতেন কৃষ্ণধন। স্বর্ণলতাকে তখন তিনি কি চোখে দেখতেন, বারীন্দ্রকুমারের ভাষাতেই তার ছবি আছে—'এই দীপ্তা গরিয়সী মেয়েটির পদ্ম চোখের ভ্রুকুটি আর অশ্রুকে বাবা যে কি মর্মান্তিক ভয়টা করতেন, তা ছিল একটা দেখার জিনিস।'

এই অবস্থার অনিবার্য পরিণতি কৃষ্ণধনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল। তারপর আর একটি দুর্ঘটনার সংবাদে নিভে গেল তাঁর জীবনদীপ। অরবিন্দ তখন ইংলন্ডে। তাঁর আই সি এস পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার সংবাদ পেয়ে উচ্চাভিলাষী পিতা দেশে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন অরবিন্দকে। অরবিন্দ রওনা হলেন কিন্তু বিধাতার অমোঘ নির্দেশে তাঁর যাওয়া হল না শেষ পর্যন্ত। আর যে জাহাজে তাঁর যাওয়ার কথা ছিল, সেই জাহাজটাই জলে ডুবে গেল। সুদূর বাংলাদেশে বসে স্নেহশীল পিতা শুধু জাহাজডুবির খবরটা পেলেন, জানতে পারলেন না যে, অরবিন্দ সে জাহাজে ছিলেন না। 'এই দুর্বিসহ শোকে মৃত্যুমুখে পতিত' হলেন কৃষ্ণধন। প্রাণাধিক পুত্রের বিশ্ববিজয়ী প্রতিভার দীপ্তি আর তিনি চোখে দেখে যেতে পারলেন না। কৃষ্ণধনের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে রাজ প্রতিনিধি এল স্বর্ণলতার কাছে। সংবাদ পেয়ে থর থর করে কেঁপে উঠলেন স্বর্ণলতা। কাশীতে কৃষ্ণধন-জননী কৈলাশকামিনী দেবীও তখন জীবিত।

স্বর্ণলতার জীবনে দুঃখের লীলা থাকলেও, সুখসম্পদের অভাব ছিল না। সন্তানগর্বে তিনি সারা ভারতের নমস্যা জননী। তাঁর চার পুত্রই খ্যাতিমান। বিনয়ভূষণ, মোহন, বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার এবং সবার উপরে ঋষি অরবিন্দ। অরবিন্দের পরে স্বর্ণলতার আর একটি পুত্র জন্মায়, কিন্তু দীর্ঘায়ু হয়নি।

জননীকে অসাধারণ ভক্তি করতেন অরবিন্দ। শৈশবে স্বর্ণলতা তাঁকে মাঝে মাঝে ঘরে পুরে রাখতেন বলে, সেকথা স্মরণ করে তিনি বলতেন—'আমি পাগল মায়ের পাগল ছেলে।' অরবিন্দের বাংলা ভাষা শিক্ষক দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন—'মায়ের প্রতি অসাধারণ ভক্তির পরিচয়ে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।' তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকোত্তর জীবনে জননীকে মাসোহারা

পাঠাতে তাঁর কখনও ভুল হয়নি।

অরবিন্দ পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলেন বিদেশে। দেশে ফেরার পর প্রথমেই তাই তিনি যান জননীর কাছে। স্বর্ণলতা তখন দেওঘরে। সেখানেই মাতা-পুত্রে মিলন হয়। অরবিন্দের কর্মজীবন তখনও শুরু হয়নি। জননীর আশীর্ব্বাদ মাথায় করেই তিনি পায়ে পায়ে এগিয়ে যান তাঁর লোকোত্তর দিব্যজীবনের পথে।

স্বর্ণলতার জীবনে সুখদুঃখের পর্ব খুবই রোমাঞ্চকর। প্রথম জীবনে তিনি যেমন সুখ-সম্পদে কাটিয়েছিলেন, শেষজীবনে তেমনি তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল অপরিসীম লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য। কিন্তু দুঃখসুখের এই নিত্য দোলায় স্বর্ণলতার পত্রে-পল্লবে যেকটি কুসুম প্রস্ফুটিত হয়েছিল, সেই সৌরভে আজও দিকবিদিক সুবাসিত হয়ে আছে।

শরৎ-জননী ভুবনমোহিনী দেবী

শরৎচন্দ্রের জীবনে ও সাহিত্যে ভাগলপুরের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই ভাগলপুরেই ছিল তাঁর মাতুলালয় এবং এইখানেই তাঁর শৈশব কৈশোরের অনেকগুলি বছর অতিবাহিত হয়। শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন ভাগলপুরের একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। শরৎ-জননী ভুবনমোহিনী হলেন তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা। কেদারনাথের দুই পুত্র হলেন ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাস। শরৎ সাহিত্যে এই সব চরিত্রগুলির প্রভাব অবিস্মরণীয়। কেদারনাথের ভৃত্য মুশাই পর্যন্ত বিপ্রদাস গ্রন্থে ধর্মদাস রূপে অমর হয়ে আছে।

মতিলালের সঙ্গে ভুবনমোহিনীর যখন বিয়ে হয়, তখন তিনি সাত বছরের বালিকা-মাত্র আর মতিলাল বিদ্যালয়ের ছাত্র। মতিলালকে তাঁর মা এক রকম সঁপে দিয়েছিলেন কেদার নাথের পিতা রামধনের হাতে। বিয়ের পর মতিলাল তাঁর খুড়শ্বশুর অঘোরনাথের সঙ্গে স্কুলে পড়াশোনা করতেন। শ্বশুরালয়ে তিনি রামধন এবং কেদারনাথের অপরিসীম স্নেহে সন্তান হিসেবেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন। ভুবনমোহিনী দেবী যতদিন জীবিত ছিলেন, মতিলাল ততদিন ঘরজামাই হিসেবেই কাটিয়েছেন।

ভুবনমোহিনী ছিলেন কেদারনাথ ও বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর আদরের দুলালী। তাঁর বিয়ের সময় হারাধন ও গোবিন্দমণি দেবীও বেঁচে ছিলেন, পৌত্রীকে তাঁরাও নয়নের মণি মনে করতেন। কিন্তু বিধির বিধানে ভুবনমোহিনী দেবীর জীবন যাঁর হাতে সমর্পিত হয়, সেই মতিলাল ছিলেন এক আশ্চর্য প্রকৃতির মানুষ। তাঁর স্বভাব ছিল যেমন আয়েসী, প্রকৃতি ছিল তেমনি শৌখিন। বিষয়-আশয়ের দিকে তাঁর একেবারেই মন ছিল না, লক্ষ্য ছিল না অর্থোপার্জ্জনের দিকে। তিনি সাহিত্যচর্চা করতেন, দাবা-তাস-পাশা খেলতেন আর তামাকুর

নেশায় কিংবা দিবানিদ্রায় কাটাতেন অলস মধ্যাহ্নগুলি। দার্শনিক মতিলাল পুজো আর্চা মানতেন না, মানতেন মানুষকে। তাঁর এই মানবপ্রেমই পুত্র শরৎচন্দ্রের উত্তর জীবনকে অলৌকিক করেছে। মহৎ করেছে তাঁর সাহিত্য সাধনা। মতিলালের খামখেয়ালির সীমা পরিসীমা ছিল না। প্রথম জীবনে তিনি হাঁজিপুরে শিক্ষকতা করতেন, পরিবার থাকত দেবানন্দপুরে। হঠাৎ ইস্তফা দিয়ে তিনি চলে আসেন ভাগলপুরে। কিন্তু পিত্রালয়ে স্নেহ থেকে বঞ্চিত না-হলেও, ভুবনমোহিনী যেন নিজেকে পরাশ্রিত মনে করতেন। স্বামীকে সংসারী করে তুলতে তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। মতিলাল সে যুগে এফ-এ পাশ ছিলেন, কিন্তু চাকরি করার মত ধৈর্য তাঁর ছিল না। ভুবনমোহিনী দেবী আপ্রাণ চেষ্টা করে স্বামীকে বাস্তবমুখী করে তোলেন। তাঁরই প্রেরণায় মতিলাল ভাগলপুরের জেলে তিরিশ টাকা মাইনের একটি চাকরি জোগাড় করেন। স্বামীর কষ্টার্জিত এই তিরিশটি টাকা ভুবনমোহিনী দেবীর পরম তৃপ্তি ও শ্লাঘার বস্তু ছিল।

ভুবনমেহিনী দেবী ছিলেন স্নেহশীলা, সেবাপরায়ণা এবং শান্ত প্রকৃতির। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ছিল তাঁর ভূষণ। কিন্তু তাঁর চরিত্রের অন্তরালে বলিষ্ঠতার একটা মহিমা বিরাজ করত। সেই নির্বাক নিঃশব্দ বলিষ্ঠতাটুকু না থাকলে মতিলাল হয়তো ভেসে যেতেন। আর তাঁকেও সন্তানদের নিয়ে আরও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হত। মতিলালের জীবনে স্থিতিশীলতা ছিল না। তাই তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল দারিদ্র্য। তাঁর ঘনঘন মত পরিবর্তনে বিব্রত হলেও, ভুবনমোহিনী দেবী কিন্তু কখনও বিরক্ত হননি। এই সমস্ত দুর্লভ গুণের জন্য মতিলাল পত্নীকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর খাপছাড়া খামখেয়ালি জীবনে ভুবনমোহিনী ছিলেন ধ্রুবতারার মত ভাস্বর।

ভুবনমোহিনী দেবীর প্রথম সন্তান হলেন অনিলাদেবী। পানিত্রাসের কাছে সামতাবেড়ের পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। শরৎচন্দ্রের নারীর মূল্য রচনার সঙ্গে অনিলাদেবী বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছেন।

অনিলাদেবীর পরে ভুবনমোহিনীর আর একটি কন্যা জন্মায়। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হয়েই সে মারা যায়। তারপর জন্ম হয় শরৎচন্দ্রের। তখন মতিলালের সংসারের অবস্থা জরাজীর্ণ। শরৎচন্দ্রের পর ভুবনমোহিনীর আরও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ

করেন—প্রভাস ও প্রকাশ চন্দ্র। এই প্রভাসচন্দ্রই উত্তরকালে সন্ন্যাস নিয়ে স্বামী বেদানন্দ নামে পরিচিত হন।

ভুবনমোহিনী দেবী পুত্রকন্যাদের মধ্যে শরৎচন্দ্রকেই সর্বাধিক স্নেহ করতেন। জননী সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলেছেন—'আমার মা ছিলেন খুবই উদার প্রাণ। সংসারের সকল দুঃখকষ্ট তিনি হাসি মুখেই সহ্য করতেন। ত্যাগ, কর্তব্যবোধে, নিষ্ঠা, স্নেহপ্রবণতা—এই সব গুণের সমন্বয়ে গঠিত ছিল তাঁর চরিত্র। স্বামীসেবা ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। নিজের হাতে বাবার তামাক সাজতেন। পতিভক্তি ও সন্তানপালনে তিনি আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ জননী। 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি অবিস্মরনীয় জননী চরিত্র সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রকে যে তাঁর জননী ভুবনমোহিনী দেবীর চরিত্র অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। সিদ্ধেশ্বরী, বিশ্বেশ্বরী, নারায়ণী, অন্নপূর্ণা, দয়াময়ী প্রভৃতি চরিত্রে ভুবনমোহিনী দেবীর ছায়াই প্রতিফলিত হয়েছে।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে এই মহিয়সী জননীর মৃত্যু হয়। শরৎচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র উনিশবছর। সবে এন্ট্রাস পাশ করে এফ এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছেন। মাতৃহীন হয়ে দুঃখ অনুভব করার আগেই তাঁকে জীবিকার সন্ধানে বেরোতে হয়। বিধাতার অমোঘ নির্দেশে পিতার মত পুত্রের জীবনও ভ্রাম্যমান হয়ে ওঠে।

ভুবনমোহিনী দেবীর মৃত্যুর আট বছর পরে মতিলাল দেহত্যাগ করেন। শরৎচন্দ্রের পরিপূর্ণ আলো তখনও সাহিত্যাকাশকে আলোকিত করেনি; খ্যাতি এবং সৌভাগ্যও তখন দূরে অপেক্ষমান। মতিলালের সংসারে শান্তি পেলেও, ভুবনমোহিনী দেবীর কখনও স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করতে পারেননি। কিন্তু সহিষ্ণুতা ছিল তাঁর ভূষণ। পুণ্যময় সারাজীবন ধরে তিনি যে দীপশলাকা সাজিয়ে রেখেছিলেন, তারই দীপ্তি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে। শরৎচন্দ্রের পূর্ণ আলোকেই প্রকাশিত হয় সৃষ্টির ভুবনমোহিনী রূপ।

সংসারে ভুবনমোহিনীর স্থান কেমন সুদৃঢ় ছিল, এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের একটি পত্রাংশ সাক্ষ্য দেয়। শরৎচন্দ্র লিখেছেন—'মায়ের মৃত্যুর পরে বাবা প্রায় পাগলের মতো হয়ে যা কিছু ছিল সমস্ত বিলিয়ে নষ্ট করে দিয়ে স্বর্গগত হন।' (২৪ আগষ্ট ১৯১৯)।

বিধান-জননী অঘোরকামিনী দেবী

একটি আদর্শ পরিবার গঠনে একজন গৃহবধুর ভূমিকা কি, সন্তানের চরিত্র নির্মাণে একজন জননীর প্রভাব কতখানি হতে পারে, বিধান-জননী অঘোরকামিনী দেবী তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নিরক্ষরা বালিকাবধূ হিসেবে সংসার জীবনে এসে তিনি কর্তব্য সম্পাদনে, প্রেমে, স্নেহে, মায়া-মমতায় সংসারের মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। তাঁর কর্মযজ্ঞ শুধুমাত্র সংসারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সমাজের বিভিন্ন দিকে তা প্রসারিত হয়। শিক্ষাবিস্তার, সমাজসেবা প্রভৃতি কাজে তাঁর আত্মনিবেদন উল্লেখ করার মত। একজন সাধ্বী নারী জীবনে কি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা নিতে পারেন, অঘোরকামিনী দেবীর কর্ম ও ধর্মজীবন তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রকাশচন্দ্রের পরিবার যে পরবর্তীকালে 'অঘোর পরিবার' নামে সুবিখ্যাত হয়, এই সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল।

অঘোর কামিনী দেবীর জন্ম হয় ১২৬৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। তাঁর বিপিনচন্দ্র বসু ছিলেন একজন বিত্তবান জমিদার। অঘোরকামিনী দেবীর যখন বিবাহ হয়, তখন সেকালের প্রথা অনুযায়ী তিনি ছিলেন দশ বছরের বালিকা। যাঁর সঙ্গে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, সেই প্রকাশ চন্দ্রের ছিল মাত্র আঠারো বছর, সবে এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। প্রকাশচন্দ্র নিজেও ছিলেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বংশের সন্তান।

পিতৃ ও শ্বশুরকুল বিত্তবান হলেও, অঘোরকামিনী দেবীর প্রথম সংসার জীবন কাটে কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে। দুই অগ্রজ ভারতচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্রের মধ্যে পারিবারিক বিবাদ মীমাংসা করতে ব্যর্থ হয়ে প্রকাশচন্দ্রকেই সেই বিরাট পরিবারের দায়িত্বভার মাথায় নিতে হয়। দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যও সমগ্র পরিবারকে আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি অগোরকামিনী দেবীকে। তিনি অপরিসীম ধৈর্য, শ্রমশীলতা, আত্মসংযম, সহিষ্ণুতা এবং ঈশ্বর নির্ভরতা দিয়ে সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করেন। বিধাতার সম্ভবতঃ তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে নিখাদ সোনায় পরিণত করার অভিপ্রায় ছিল। অঘোরকামিনী দেবীর গৌরবময় জীবন প্রমাণ করেছেন যে, তিনি সেই অগ্নিপরীক্ষায় নিজেকে কতটা উজ্জ্বল করে তুলতে পেরেছেন।

প্রকাশচন্দ্র প্রথম জীবনে ওকালতি করতেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল যে, ওকালতি করে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করবেন। কিন্তু আইন ব্যবসায় কিছুদিন কাটাবার পর তিনি উপলব্ধি করেন যে, এই বৃত্তিতে কোনভাবেই বিবেক ঠিক রাখা যাবে না। তখন বাধ্য হয়ে তিনি এই বৃত্তি পরিত্যাগ করেন। তারপর পরীক্ষা দিয়ে বর্ধমানে অস্থায়ী পোষ্টমাস্টার পদে নিযুক্ত হন (১৮৭২)।

অগত্যা অঘোরকামিনী দেবীকে শ্বশুরালয়ে থাকতে হয়। সংসারে সমস্ত কাজও তাঁকে করতে হত। ঘর পরিষ্কার, রান্নাবান্না, গরুর জাব কাটা, গোবর দেওয়া, চিঁড়ে কোটা—এই সমস্ত ছিল তাঁর নিত্যকর্ম। প্রকাশচন্দ্র বেশি টাকা পাঠাতে পারতেন না বলে অঘোরকামিনী দেবীকে নির্ভর করতে হত সেজ ভাণ্ডারে উপার্জনের ওপর। এ জন্যে সংকীর্ণমনা রমণীদের বাক্যবাণ তাঁকে জর্জরিত করেছিল। কিন্তু অঘোরকামিনী দেবী ছিলেন ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি, সর্বশক্তি দিয়ে তিনি সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা প্রতিহত করার চেষ্টা করেন।

অঘোরকামিনী দেবী নিরক্ষরা ছিলেন বলে প্রকাশ চন্দ্র তাঁকে বিদ্যালাভে উৎসাহিত করতেন এবং রাত্রে তাঁকে পড়াতেন। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে অঘোরকামিনী দেবী পরবর্তীকালে যা করেছেন, তা একজন অসাধারণ রমণীর পক্ষেই সম্ভব। তাঁর দুই যুবতী কন্যার সঙ্গে তিনি লক্ষ্মৌ উইমেন্স কলেজে ভর্তি হন। মিস থোবর্ন নামে একজন খ্রীষ্টান মহিলা এই কলেজটি পরিচালনা করতেন। কঠোর পাঠাভ্যাসের জন্যে তিনি ন'মাস ছাত্রাবাসেও ছিলেন।

শিক্ষার প্রতি তাঁর এই ঐকান্তিক আগ্রহ তাঁকে পরবর্তীকালে শিক্ষাবিস্তারেও উৎসাহিত করে তোলে। প্রকাশচন্দ্রের পরবর্তীকালের কর্মস্থল বিহারের বাঁকিপুরে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং একটি ছাত্রীনিবাস স্থাপন করেন। অঘোরকামিনী দেবী প্রতিষ্ঠিত সেই বিদ্যালয় আজও বিদ্যমান। এই বিদ্যালয়ের কার্য-পরিচালনা এবং শিক্ষাদানে তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তার তুলনা বিরল। তিনি বাংলা ভাষায় পারদর্শিনী ছিলেন এবং ইংরেজি ও হিন্দী ভাষা জানতেন—

গ্রাম্য বালিকাবধূ হলেও অঘোরকামিনী দেবী নারীর সমান অধিকার সম্পর্কে প্রগতিশীলা নারীর মত সচেতন ছিলেন। জননীর এই উদার মনোভাব এবং অনমনীয় দৃঢ়তা পুত্র কন্যাদের চরিত্রকেও বলিষ্ঠ করে তোলে।

সংসারের বাইরে শিক্ষালাভ এবং সমাজ সেবা করতে গিয়ে অঘোরকামিনী দেবীর চরিত্রের যথার্থ বিকাশলাভ হয়। প্রকাশচন্দ্র তাঁর সুবিখ্যাত 'অঘোর প্রকাশ' গ্রন্থে পত্নী সম্পর্কে লিখেছেন—বাহিরে আসিয়া তোমার মনের স্বাধীনভাব বাড়িতে লাগিল, সাহস বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে নারী জাতির অধিকার বিষয়ে, নারীজীবনের আদর্শ বিষয়ে, চিন্তার স্রোত ফুলিয়া যাইতে লাগিল। যতই তুমি বাহিরের জগৎ দেখিতে লাগিলে, ততই বুঝিতে পারিলে, এদেশে নারীর অবস্থা কত হীন এবং তাঁহার উন্নতির পথে পদে পদে কত বাধা—ততই তোমার মনে ক্লেশও বাড়িতে লাগিল।'

মাসিক আয় যখন আশী টাকা ছিল, তখন তিনি তা থেকে জননীকে তিরিশ টাকা পাঠিয়ে বাকি টাকা পত্নীর হাতে দিতেন। অঘোরকামিনী সেই টাকায় সংসার চালিয়ে আত্মীয় স্বজন, দীন দরিদ্র সকলের প্রয়োজনে সাহায্য করতেন। একবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় তিনি যা সেবা এবং সাহায্য করেছিলেন, তার তুলনা নেই। সংসার জীবনের ওপর তাঁর এই কর্তৃত্ব তিনি কখনও শিথিল হতে দেননি। পরবর্তীকালে প্রকাশচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে অধিক উপার্জন করলেও, অঘোরকামিনী দেবী সংসারের খরচ না-বাড়িয়ে দীন-দরিদ্রের প্রতি সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়েছিলেন।

জীবনে সাজসজ্জা, অলঙ্কার প্রভৃতির ওপর অঘোরকামিনী দেবীর কোন আগ্রহ বা আসক্তি ছিল না। একবার গ্রামের বাড়িতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন

যে, তাঁর সাধারণ সাজসজ্জার চেয়ে ভাল শাড়ি গহনা পরিহিতা অন্য রমণীদের বেশি সমাদর করা হচ্ছে। এই বৈষম্যে তিনি অত্যন্ত আঘাত পান এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, জীবনে কোনদিন এই ভেদাভেদ করবেন না। সারাজীবন তিনি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন।

কুসংস্কার মুক্ত, শুদ্ধাচারী অঘোরকামিনী দেবী যেমন ধর্ম-পরায়ণা ছিলেন, তেমনি ছিলেন শৃঙ্খলা পরায়ণা। উদয়াস্ত তিনি যে কর্ম চাঞ্চল্যের মধ্যে দিন অতিবাহিত করতেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। প্রকাশচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে এই কর্ম ব্যস্ততার একটি বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত করেছেন। স্বামীর সঙ্গে অঘোরকামিনী দেবী যে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় যোগাদান করতেন, সেখানেও তাঁর বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ত। উপাসনার সময় আচার্যদের যখন বলতেন— আমরা দন্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করি, তখন সমস্ত পুরুষরা উঠে দাঁড়াতেন। কোন নারী উঠতেন না। অঘোরকামিনী দেবী কিন্তু উঠে দাঁড়াতেন। এজন্যে তাঁকে অনেক নিন্দা ও ভর্ৎসনা সহ্য করতে হয়। তিনি সে সব ভ্রূক্ষেপই করতেন না। আপন সিদ্ধান্তে অটল থাকতেন।

অঘোরকামিনী দেবী দুই কন্যা তিন পুত্রের জননী—সুসারবাসিনী, সরোজিনী, সুবোধচন্দ্র, সাধনচন্দ্র এবং বিধানচন্দ্র। তাঁর পুত্র কন্যারা সকলেই ছিলেন কৃতবিদ্য!

কনিষ্ঠ পুত্র বিধানচন্দ্রের জন্মের পর পতি-পত্নী সংকল্প করেন যে তাঁদের আর কোন সন্তান হবে না। কারণ 'অধিক সন্তান সন্ততি হলে নারীর ধর্মসাধনায় ব্যাঘাত হয়।' তাঁরা স্থির করেন যে, প্রথম ছ'মাস তাঁদের মধ্যে শুধুমাত্র আত্মিক মিলন হবে, কোন দৈহিক সম্পর্ক থাকবে না। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে এই দুঃসাধ্য ব্রত উদযাপন করার সংকল্প এই দম্পতি সারাজীবনের জন্য গ্রহণ করেন। তখন পতিপত্নী উভয়েরই পরিপূর্ণ যৌবন—প্রকাশচন্দ্রের বয়স চৌত্রিশ বছর, অঘোরকামিনী দেবীর ছাব্বিশ। এই ত্যাগ এবং তিতিক্ষার আদর্শেই বিধানচন্দ্র চিরকৌমার্য্যের সংকল্প নেন।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে একবার গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হয়েও, অঘোরকামিনী দেবী পুনর্জীবন লাভ করেন। তারপর পাটনার বাঁকিপুরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। বিধানচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র চোদ্দ বছর।

অঘোরকামিনী দেবীর মৃত্যুর পর প্রকাশচন্দ্র যতদিন জীবিত ছিলেন সাধ্বী পত্নীর পুণ্যস্মৃতিকে অবলম্বন করেই তিনি বেঁচেছিলেন। প্রকাশচন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর। তাঁর সর্বশেষ ইচ্ছানুযায়ী তাঁর চিতাভস্ম পুণ্যবতী পত্নীর পবিত্র ভস্মাধারে একত্রে রাখা হয়। সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং পারলৌকিক জীবনে এমন দম্পতি সর্বকালেই দুর্লভ!

কৈশোরে মাতৃ বিয়োগ হলেও বিধানচন্দ্রের অন্তরে জননীর স্মৃতি চির জাগরূক ছিল। জননীকে তিনি দেবীর আসনে বসিয়েছিলেন। উত্তরকালে একবার পাটনার বাড়িতে গিয়ে তিনি জননীর একখানি পরণের শাড়ি পান। মোটা সুতোয় বোনা সেই অতি সাধারণ শাড়িটি হাতে পেয়ে বিধানচন্দ্র হৃদয়ের আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। জননীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল এমনই সুগভীর।

যতীন্দ্রমোহন-জননী বিনোদিনী দেবী

চট্টগ্রামের শঙ্খনাদের একটি ক্ষুদ্র শাখা হল যৎ। এই যৎ নদ-তীরবর্তী এক দরিদ্র বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন (১৮০৫) যাত্রামোহন সেনগুপ্ত। অল্পবয়সে পিতৃহীন হওয়ায় তিনি নিদারুণ আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে পড়েন, কিন্তু আপন বুদ্ধি এবং অধ্যবসায়ের ফলে মেধাবী ছাত্র হিসেবে তিনি বিদ্যালয়ে সকলের স্নেহ লাভ করেন। তিনি এন্ট্রাস পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করেন এবং তারপর বহু অভাব অনটনের মধ্যে বি. এ. ও বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তাঁর সঙ্গে ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগীরের চতুর্থ কন্যা বিনোদিনী দেবীর বিবাহ (১৮৭৭) হয়। কলকাতায় এসে যাত্রামোহন অন্নদাচরণের সঙ্গে পরিচিত হন। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক হলেও অন্নদাচরণ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে যশস্বী হয়ে ছিলেন। কলকাতায় আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে তাঁর স্মরণীয় অবদান ছিল।

স্বাধীনচেতা পুরুষ হিসেবে অন্নদাচরণের সুনাম ছিল। ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার সময় মেয়েদের যোগদান করার অধিকার প্রধানতঃ তাঁর জন্যেই অর্জিত হয়েছিল।

যাত্রামোহনের সঙ্গে আলাপ হবার পর অন্নদাচরণ তাঁর দিকে খুবই আকৃষ্ট হন এবং মনে মনে তাঁকে জামাতা মনোনয়ন করেন। জামাতা নির্বাচনে

অন্নদাচরণ ভুল করেননি। কন্যার বিবাহিত জীবন দেখে তিনি অতীব সুখী হয়েছিলেন।

বিনোদিনী দেবীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করার পর যাত্রামোহন চট্টগ্রামে ওকালতি শুরু করেন। সেসময় এ দেশে ইংরেজি জানা আইনজীবি বেশি ছিল না, যাত্রামোহন ছিলেন ইংরেজিতে কৃতবিদ্য। অচিরেই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং তিন-চার লক্ষ টাকার সম্পত্তি করেন। পরহিতব্রতী যাত্রামোহনের জমিদারিতে যাঁরা প্রজা ছিলেন, তাঁদের সুখের সীমা ছিল না।

যাত্রামোহনের মত তাঁর পত্নী বিনোদিনী দেবীও ছিলেন পরহিতব্রতী। এই সরল-হৃদয়া জননী নিজ-সন্তান পর-সন্তান ভেদ করতেন না তিনি হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন এবং দেবদেবীর ওপর তাঁর অসাধারণ ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল। যাত্রামোহন শেষজীবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু পত্নীর ইচ্ছানুযায়ী বাড়িতে দুর্গোৎসব করতেন। এই উৎসবে বিনোদিনী দেবী অকাতরে অর্থব্যয় করতেন, বাড়িতে আনন্দের ঢেউ বয়ে যেত।

বিনোদিনী দেবীর আট পুত্র, সাত কন্যা। পুত্রকন্যারা সকলেই কৃতবিদ্য ছিলেন, তৃতীয় পুত্র স্বনামধন্য যতীন্দ্রমোহন এবং চতুর্থ পুত্র নীরেন্দ্রমোহন ছিলেন খ্যাতনামা চিকিৎসক। কন্যা নলিনীবালা এবং কনিষ্ঠ পুত্র রমেন্দ্রমোহনও মেধাবী ছিলেন। বিনোদিনী দেবী বেশি লেখাপড়া শেখেননি, কিন্তু তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য নিয়ে পুত্রকন্যারা বিকশিত হয়েছিলেন।

সরল হৃদয়া বিনোদিনী দেবী পুত্রকন্যাদের প্রাণাধিক স্নেহ করতেন আর যতীন্দ্রমোহনকে চোখের আড়াল করতেন না। যতীন্দ্রমোহন যখন তাঁর গর্ভে, তখন তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, বিশাল সাগরে একটি নীল পদ্ম প্রস্ফুটিত এবং তার ওপরে একটি নীল শিশু খেলা করছে। ঈশ্বর বিশ্বাসী বিনোদিনী দেবী তাই যতীন্দ্রমোহনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করতেন। জননীর এই বিশ্বাস যে অমূলক ছিল না, যতীন্দ্রমোহনের পুণ্যময় জীবন তার সাক্ষী।

যাত্রামোহন স্বাস্থ্যবান না হলেও, বিনোদিনী দেবী স্বাস্থবতী এবং দীর্ঘাঙ্গী ছিলেন। তাঁর পুত্ররাও খেলাধূলায় পারদর্শী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। স্নেহময়ী জননী পুত্রকন্যাদের কোন ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেননি—যাত্রামোহন না করলে জননী সেই ইচ্ছা পূর্ণ করতেন।

যতীন্দ্রমোহন এন্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাঁকে ব্যারিস্টারি পড়তে

ইংলন্ড পাঠানোর কথা হয়, কিন্তু স্নেহময়ী জননী পুত্রকে চোখের আড়াল করতে রাজী হন নি। জননীর অমতে যতীন্দ্রমোহনও যেতে চাইলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি করা হল।

কিছুদিন পরে এক আত্মীয়ের সঙ্গে আবার ইংলন্ড যাত্রার সুযোগ এল। যাত্রামোহন এবার পত্নীকে রাজী করালেন, কিন্তু পুত্রের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে মত দিলেও, জননী তাঁর অন্তর থেকে সম্মতি জানাতে পারেন নি। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, পুত্রকে চোখের আড়াল করে রাখলে সে বাঁচবে কী করে। কে তাকে বিপদ-আপদে এবং ধর্মচ্যুতি থেকে রক্ষা করবে।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে যতীন্দ্রমোহন ইংলন্ড যাত্রা করেন। অশ্রু সজল চোখে বিদায় দিলেন জননী—ইহজীবনে আর সত্যি সত্যিই পুত্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি। দু'বছর পরে কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ম দিয়ে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন (জুলাই ১৯০৬)। প্রবাসীপুত্রের জন্যে তিনি প্রায়ই অশ্রুবর্ষণ করতেন।

যতীন্দ্রমোহনও মাতৃবিয়োগে শিশুর মত ভেঙে পড়েন। তিনি পরবর্তীকালে দেশে ফিরে দেশজননীকে মাতা বলে যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তাতে কৃতার্ত হয়েছে সমগ্র দেশবাসী।

যাত্রামোহন বিনোদিনী দেবীকে লক্ষ্মীর মত মনে করতেন। তাঁর জীবনে বিনোদিনী দেবী সত্যি সত্যিই লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, যাত্রামোহন ততই উন্নতির পথে অগ্রসর হন। বিনোদিনী দেবী যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন যাত্রামোহনের বাসভবনের কিছুটা কার্নিস ভীষণ শব্দে ভেঙে পড়ে। বিনোদিনী দেবী বার বার ওই শব্দের কারণ জিজ্ঞেস করলে যাত্রামোহন বলেন—কার্নিস ভেঙেছে।

কিন্তু বিনোদিনী দেবী মাথা নেড়ে উত্তর দেন—না, এ কার্নিস ভাঙা নয়, এ আপনার লক্ষ্মী ভাঙা।

ধর্মশীলা সাধ্বী পত্নীর এই কথা সত্য প্রমাণিত হয়। এই ঘটনার অল্প কয়েকদিন পরেই বিনোদিনী দেবী প্রাণত্যাগ করেন।

পত্নীর পবিত্র স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করার জন্যে যাত্রামোহন নিজের গ্রামে 'বিনোদিনী বালিকা' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরহিতব্রতী রমণীর প্রতি নিবেদিত যথার্থ মর্যাদা।

সুভাষ-জননী প্রভাবতী দেবী

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র নেতাজীরূপে অভিনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তারুণ্যের প্রতীক। শৌর্য, বীর্য আর লাবণ্যের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর কান্তিতে। কিন্তু তাঁর প্রগাঢ় দেশপ্রেম, অমিতবীর্য এবং অপরাজেয় পৌরুষের অন্তরালে ছিল একটি ধর্মনিষ্ঠ কোমল অন্তকরণ। আশৈশব জননী প্রভাবতী দেবীর সান্নিধ্যে থেকেই তিনি এই ধর্মভীরু কোমল সত্তাটি লাভ করেছিলেন। এই আড়ম্বরহীন ধর্মপ্রাণতাই তাঁর গৌরবময় কর্মজীবনে দেশপ্রেমরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

সুভাষ-জননী প্রভাবতী দেবী ছিলেন করুণার একমাত্র উৎস্থল। তিনি প্রতিদিন জননীর কাছে 'কথামৃত' পড়তেন। এই অমৃতই পরবর্তীকালে তাঁর জীবনকে অমৃতময় করে তোলে। জননীর কাছে শিক্ষালাভকে তাই সুভাষচন্দ্র সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর নিজের ভাষায়—'আমরা মাতৃস্তন্যে পুষ্ট সুতরাং মাতৃউপদেশ মাতৃশিক্ষা আমাদের যত উপকার ও উন্নতি করিতে পারে—আর কিছুতেই তত হয় না।"

সুভাষচন্দ্রের পিতা জানকীনাথ ছিলেন কটকের খ্যাতনামা সরকারী উকিল। কর্মকুশলতার জন্যে তিনি রায়বাহাদুর খেতাব পেয়েছিলেন আর শহরবাসী আদর করে তাঁকে পৌরপিতার আসনে বসিয়েছিল। সংসারে মনোযোগ দেবার সময় তাঁর ছিল না, প্রয়োজনও হয়নি। প্রভাবতী দেবীর ওপর সমস্ত ভার দিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত থাকতেন।

প্রভাবতী দেবী বিশাল এক সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। বলতে গেলে একটি সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী। তাঁর নিজের আটপুত্র, ছয়কন্যা—তার ওপর তাঁর নিজের চার পাঁচটি ছোট ছোট ভাইও তাঁর কাছে থেকে পড়াশোনা করতেন। এছাড়া দাসদাসী এবং নানারকম জীবজন্তু মিলিয়ে এক বিশাল সংসার। প্রভাবতী নিপুণভাবে এই সংসার পরিচালনা করতেন। তাঁর স্নেহ যেমন অফুরন্ত ছিল, সংসারের সমস্ত দিকে তেমনি ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। সন্তানেরা যাতে জীবনে সুশিক্ষা লাভ করে, তার জন্যে জননীর যত্নের সীমা পরিসীমা ছিল না। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পরিচালনাতেই তাঁর ধর্মভাব ফুটে উঠত।

প্রভাবতী দেবীর প্রকৃতিটি ছিল অত্যন্ত শৌখিন। তিনি নিজে খুব বেশি লেখাপড়া না জানলেও তাঁর হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মত। পরবর্তীকালে কৃতী পুত্রদের গৌরবোজ্জ্বল জীবন দেখে তিনি পড়াশোনা করেন। একজন বিদেশিনীর কাছে ইংরেজি শিক্ষাও করেছিলেন। সমস্ত রকম গার্হস্থ্য কাজকর্মে তাঁর শুচিস্নিগ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন থাকত। তাঁর স্বভাব ছিল অত্যন্ত উদার। ধর্মভাব থাকলেও, তাঁর মধ্যে কোন কুসংস্কারক ছিল না। জননীর এই শুচিস্নিগ্ধ উদারতাই শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্র প্রমুখ পুত্রদের জীবনে দেশপ্রেমরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র যখু আই-সি-এস ত্যাগ করে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করার প্রস্তাব করেন, তখন জননী প্রভাবতী দেবী বলেছিলেন, যে তিনি মহাত্মা গান্ধীর ত্যাগের মন্ত্রে বিশ্বাস করেন। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে পিতারও গৌরবের অন্ত ছিল না। সুভাষচন্দ্রের প্রথমবার কারাবরণের পর জানকীনাথ লিখেছিলেন—আমরা সুভাষের জন্য গর্বিত। প্রভাবতী দেবী সুভাষচন্দ্রকে অপরিসীম স্নেহ করতেন। চিঠিতে লিখতেন—'প্রাণাধিক সুভাষচন্দ্র'। জননীর প্রতি সুভাষচন্দ্রেরও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর বিখ্যাত 'পত্রাবলী'র শ্রেষ্ঠ পত্রগুলির বেশির ভাগই জননীকে লেখা। তিনি নিজেও একবার লিখেছিলেন—'মা, আমি যখন চিঠি লিখতে বসি তখন পাগলের চেয়েও পাগল। জননীর অনুমতি ছাড়া তিনি কোন কাজে অগ্রসর হননি।

মহানব্রত থেকে জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারেও সুভাষচন্দ্র জননীর অনুমতি প্রার্থনা করতেন। জননীর ওপর তাঁর কি অগাধ আস্থা এবং শ্রদ্ধা

ছিল, তা তাঁর পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুটিত হয়েছে। গর্ভধারিণী জননী থেকেই বিশাল ভারতবর্ষকে জননীজ্ঞানে সেবা করা তাঁর ধর্ম হয়ে ওঠে। জননী প্রভাবতী দেবীই ছিলেন তাঁর সমস্ত চিন্তাধারার কেন্দ্রস্থল। একবার একটি পত্রে তিনি লেখেন—মা, ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান—এই মহাদেশে লোকশিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্টা ধরণীকে পবিত্র করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু একবার তিনি কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাই বলি, আমাদের জন্মভূমি, ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ।

জননীর প্রতি সুভাষচন্দ্রের এই শ্রদ্ধা পরবর্তীকালে বাসন্তী দেবীর ওপরেও বর্ষিত হয়েছিল। বাসন্তী দেবীর হাত ধরে প্রভাবতী দেবী একবার বলেছিলেন—সুভাষ আধখানা আমার, আর আধখানা তো আপনার ভাই! এই দুই জননীর স্নেহসুধার জীবন মধুময় হয়ে উঠেছিল।

ধর্মপ্রাণা প্রভাবতী দেবী শেষ জীবন পুরীর জগন্নাথধামে অতিবাহিত করেন। দেব-অরাধনাই ছিল তাঁর নিত্যকর্ম। জননীকে একবার একটি পত্রে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন—'যে পূজায় আমরা ভক্তি-চন্দন ও প্রেমরূপে ব্যবহার করিতে পারি তাহাই জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা।'

জননী ও দেশজননীর প্রতি ভক্তি ও প্রেম নিবেদন করে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা করাই ছিল সুভাষচন্দ্রের সারজীবনের তপস্যা।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে এই মহীয়সী মহিলার দেহান্ত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী

মনীষীদের রচনাবলী ও চিঠিপত্র ছাড়া যেসব গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি ঃ

১। সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
২। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। বঙ্গ-সাহিত্যে মহিলা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু
৫। আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী।
৬। আত্মচরিত—প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
৭। আত্মচরিত—কৃষ্ণকুমার মিত্র।
৮। আত্মজীবনচরিত—কার্তিকেয় চন্দ্র রায়।
৯। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত—প্রিয়নাম শাস্ত্রী সম্পাদিত
১০। কেশব জননী দেবী সারদা সুন্দরীর আত্মকথা—যোগেন্দ্র লাল খাস্তগীর।
১১। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।
১২। আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৩। আমার আত্মকথা—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।
১৪। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী।
১৫। জোড়াসাঁকোর ধারে—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণীচন্দ।
১৬। ঘরোয়া অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণীচন্দ
১৭। সুরধুনী কাব্য—দীনবন্ধু মিত্র।
১৮। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম।
১৯। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
২০। বিদ্যাসাগর—বিহারীলাল সরকার।
২১। বিদ্যাসাগর—মণি বাগচি।
২২। বিদ্যাসাগর চরিত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২৩। বিদ্যাসাগর জীবন চরিত—শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
২৪। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্মাচারী অক্ষয়চৈতন্য।
২৫। মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম।
২৬। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু।
২৭। দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায়চৌধুরী।
২৮। দ্বিজেন্দ্রলাল—নবকৃষ্ণ ঘোষ।
২৯। অরবিন্দ প্রসঙ্গে—দীনেন্দ্রকুমার রায়।
৩০। ভারত পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

৩১। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জন্ম শতপূর্তি স্মারক গ্রন্থ—খুলনা সম্মিলনী প্রকাশিত।
৩২। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—অজিতকুমার চক্রবর্তী।
৩৩। গিরিশচন্দ্র—অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
৩৪। কেশবচন্দ্র—গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়।
৩৫। রবীন্দ্র জীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
৩৬। স্বামী বিবেকানন্দ—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।
৩৭। বিবেকানন্দ চরিত—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।
৩৮। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
৩৯। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—অপর্ণা দেবী।
৪০। স্মৃতির খেয়া—সাহানা দেবী।
৪১। আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ—রাণী চন্দ।
৪২। বঙ্গগৌরব স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪৩। আমারে এ আঁধারে কল্যাণকুমার বসু।
৪৪। কবিতা, নিঃসঙ্গ প্রবাস ও মনোমোহন ঘোষ—সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪৫। সুভাষচন্দ্র—হেমন্তকুমার সরকার।
৪৬। বসু বাড়ি—শিশিরকুমার বসু।
৪৭। শরৎচন্দ্র—মণি বাগচি।
৪৮। শরৎপরিচয়—সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
৪৯। স্মৃতিকথা—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
৫০। জীবনী-শতক—মণি বাগচি।
৫১। আচার্য জগদীশচন্দ্র—সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
৫২। জীবনের ঝরাপাতা—সরলা দেবী।
৫৩। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন—সুরেশচন্দ্র ধর।
৫৪। অঘোর প্রকাশ—প্রকাশচন্দ্র রায়।
৫৫। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনচরিত—নগেন্দ্রকুমার গুহরায়।
৫৬। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সান্নিধ্যে—হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫৭। আশুতোষ স্মৃতিকথা—দীনেশচন্দ্র সেন।
৫৮। আশুতোষের ছাত্রজীবন—অতুলচন্দ্র ঘটক।
৫৯। হেমচন্দ্র—মন্মথনাথ ঘোষ।
৬০। বঙ্কিম-প্রসঙ্গ—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত।
৬১। বঙ্কিম জীবনী—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৬২। শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত—হেমলতা দেবী।